সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	আমি ও আমার ক্যারিয়ার	১-২২
দ্বিতীয়	ক্যারিয়ার গঠন : গুণ ও দক্ষতা	২৩-৪৬
তৃতীয়	ক্যারিয়ার গঠনে সংযোগ স্থাপন ও আচরণ	৪৭-৬২
চতুর্থ	আমি ও আমার কর্মক্ষেত্র	৬৩-৮৪

প্রথম অধ্যায়

আমি ও আমার ক্যারিয়ার

ক্যারিয়ার শিক্ষা একটি ব্যাপক বিষয়। এটি বোঝার জন্য পূর্বের শ্রেণিগুলোতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছি এবং সেইসব কাজের সাথে আমাদের জীবনযাপনের সম্পর্কের বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করেছি। এবার আমরা ক্যারিয়ার গঠনবিষয়ক কিছু সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে জানব। ক্যারিয়ার বিষয়ে শিক্ষা এবং এ সংক্রান্ত কাজগুলো আমাদের ক্যারিয়ারের পথ অনুসন্ধানের কৌশল নির্ধারণ ও সঠিক ক্যারিয়ার গঠনে সাহায্য করবে।

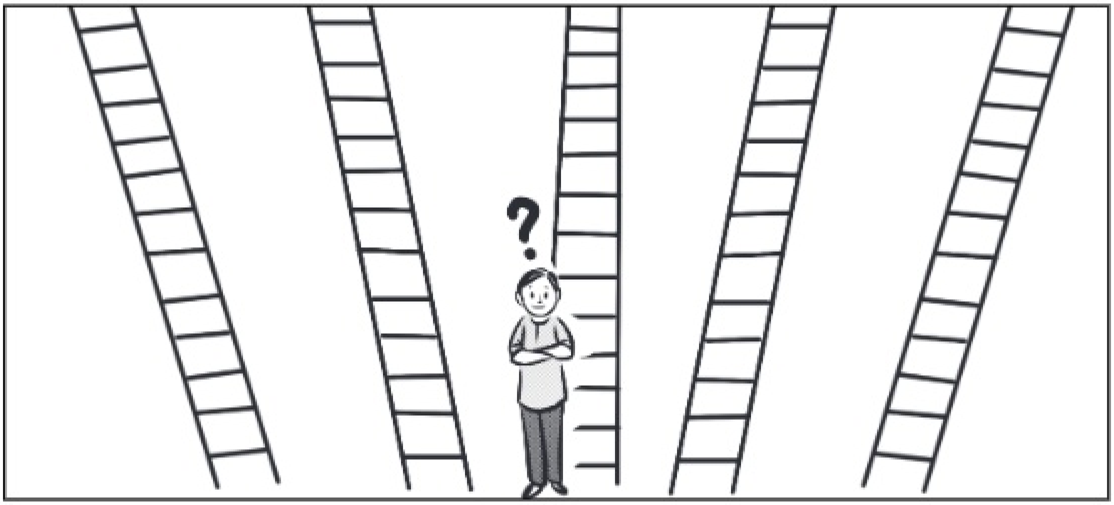

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

১. ক্যারিয়ার শিক্ষার ধারণা ও এর বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব;

২. ক্যারিয়ার শিক্ষা পাঠের যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে পারব;

৩. ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নির্ণয় করতে পারব;

৪. ক্যারিয়ারের সাথে ব্যক্তিগত আগ্রহ, যোগ্যতা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারব;

৫. ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের রূপরেখা ব্যাখ্যা করতে পারব;

৬. নিজের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের 'রূপকল্প' বিষয়ে পোস্টার ডিজাইন করতে পারব;

৭. ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আগ্রহ ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব এবং

৮. ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা অর্জনে আগ্রহী হব।

ক্যারিয়ারের ধারণা

ক্যারিয়ারের ধারণাটি ভালোভাবে বোঝার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এসো নিচের শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হই। এগুলো কি একই অর্থ বহন করে নাকি ভিন্ন ভিন্ন? কর্মসংস্থান বলতে আমরা কী বুঝি? চাকরি আর পেশার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? থাকলে সেগুলো কী? এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করা যাক।

কাজ (Work)	পেশা (Profession)
ক্যারিয়ার (Career)	বৃত্তি (Vocation/Occupation)

দলগত কাজ

এসো ক্লাসের সবাই ছোট দলে ভাগ হয়ে যাই। প্রত্যেক দল একটি করে ধারণা (কর্ম/পেশা/চাকরি/ক্যারিয়ার/বৃত্তি) বেছে নেই। এবার প্রত্যেক দল সেই ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনা শেষে ধারণাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কাগজে লিখি এবং দেয়ালের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় লাগাই। এবার একে একে প্রত্যেক দল তাদের বর্ণনা ক্লাসে পড়ে শোনাই। প্রয়োজন হলে ধারণাগুলোকে সংশোধন করি। এবার চলো, আলোচনা করে এই ধারণাগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা করি।

ক্যারিয়ার সংক্রান্ত এ ধারণাগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা বেশ কঠিন। ধারণাগুলো একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই আমরা এই ধারণাগুলোকে একই অর্থে ব্যবহার করি। যেমন আমরা অনেক সময় বলি আমার বাবা একজন কৃষক। কৃষিকাজ তার কর্ম আবার বলি, এটি তার পেশা। কিন্তু এই শব্দগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। আমরা এই পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করছি। এবার চলো নিচের ঘটনাটি পড়ি।

পরের কাজগুলো করার পর আমাদের কাছে ধারণাগুলো আরও স্পষ্ট হবে।

কেস স্টাডি: নিরুপমা নাটোর জেলার একটি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) নির্বাহী পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়েছেন। তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য তার সহকর্মীরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। সকালে উঠেই নিরুপমা বাগানে কাজ করছেন আর চিন্তা করছেন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় কী কী বলবেন। তিনি ভাবছেন, শিক্ষাজীবন থেকেই গ্রামের নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা তার ছিল– একথা দিয়েই তিনি শুরু করবেন। তার বাবার ইচ্ছা ছিল নিরুপমা ডাক্তার হোক। তার ইচ্ছা ছিল এনজিওতে কাজ করার। তাই তিনি সমাজকল্যাণ বিষয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, যা তার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু সে সুযোগ তার হয়নি। ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শেষে এনজিও-তে যোগ দেবার জন্য যা যা যোগ্যতা লাগে তা পূরণে নিরুপমা বিভিন্ন কোর্স করেছেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি একটি এনজিওতে মাঠ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তিনি শিশুশিক্ষা নিয়ে কাজ করতেন। অথচ নিরুপমার ইচ্ছা ছিল গ্রামের নারীদের কর্মসংস্থান নিয়ে কাজ করার। এজন্যে তখন তিনি বেশ কটি এনজিওতে পরীক্ষা আর সাক্ষাৎকার দেন। অবশেষে তিনি ছোট্ট একটি এনজিওর প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে যোগ দেন। তিন বছর পরে তিনি আজকের এই এনজিওতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান। গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠান স্বনামধন্য। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তার দ্রুত পদোন্নতি

হয়। আজ নিরুপমা তার স্বপ্নপূরণের পুরো পথটি মনের জানালায় দেখতে পান। অনেক পরিশ্রম আর সাধনার পথ, তবে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত। তিনি বাগান থেকে একটি গোলাপ তুলে এনে বাসায় ফুলদানিতে রাখেন। এটিও অনেক সাধনা আর যত্নের ফসল।

উপরের ঘটনাটি থেকে ছোট দলে ভাগ হয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি :

১. নিরুপমা বাগানে যে কাজ করছিলেন এটিকে আমরা কী বলব? কাজ, পেশা, বৃত্তি, চাকরি নাকি ক্যারিয়ার? তোমার উত্তরে সাথে অন্য বিষয়গুলোর পার্থক্য কী?

২. ডাক্তারি করা বা এনজিওতে কাজ করাকে পেশা, বৃত্তি, কাজ, চাকরি, ক্যারিয়ার– এগুলোর কোনটি বা কোনগুলোর আওতায় ফেলা যায়? কেন?

৩. এনজিওতে কাজ করার সময় নিরুপমা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে ছিলেন। যেমন- মাঠ কর্মকর্তা, প্রোগ্রাম অফিসার, নির্বাহী পরিচালক। এগুলোকে আমরা কী বলতে পারি। কাজ, পেশা, বৃত্তি, চাকরি নাকি ক্যারিয়ার? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত দাও।

কাজ-এর অর্থ অনেক ব্যাপক। মূলত কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনো শারীরিক বা মানসিক কর্মকাণ্ডই কাজ। এটি অর্থ উপার্জনের জন্য হতে পারে বা অর্থ উপার্জন ছাড়াও হতে পারে। পেশা মূলত এমন কাজ যার জন্য ব্যক্তির বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আর বৃত্তি হলো এমন একটি কাজ যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো শিক্ষা বা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে পারে। এটি ক্যারিয়ারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। তবে ক্যারিয়ারের সাথে পেশা বেশি সম্পর্কযুক্ত। দুটি ধারণাই কাছাকাছি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যারা বাড়ির নকশা প্রণয়ন করেন তারা হলেন পেশাজীবী। আর যারা নির্মাণ করেন তারা বৃত্তিধারী।

আমাদের আলোচনা থেকে পাওয়া ধারণার সাথে নিচের বর্ণনাগুলো মিলিয়ে দেখি :

কাজ : কোনো কিছু করাকে সাধারণ ভাষায় কাজ বলে। এটি একটি ব্যাপক ধারণা যার মধ্যে যেকোনো ধরনের কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। চাকরি, পেশা বা ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে মানুষকে যা যা করতে হয়, সেগুলো কোনো না কোনো কাজ। এর বাইরেও দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যা করে যেমন- লেখাপড়া করা, খাওয়া, ব্যায়াম করা, বাজার করা এগুলোকেও সাধারণভাবে আমরা কাজ বলে থাকি।

ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদে অবস্থান করাকে চাকরি বলে। যেমন- সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, জেলা প্রশাসন অফিসের বাগান পরিচর্যাকারী, বিদ্যালয়ের দারোয়ান, গার্মেন্টস কর্মী ইত্যাদি।

বৃত্তি ও পেশা: বৃত্তি ও পেশা শব্দ দুটিকে কখনো কখনো একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। যদিও বৃত্তি ও পেশা শব্দ দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পেশার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দরকার হয়, যা সাধারণত বৃত্তির জন্য দরকার হয় না। যেমন– একটি ভবনের নকশা যে স্থপতি করেন তাকে স্থাপত্যবিদ্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তাই এটি তার পেশা। অন্যদিকে যারা নির্মাণ শ্রমিক তাদের কাজকে বৃত্তি বলা যায়।

ক্যারিয়ার: ক্যারিয়ার হলো সব ধরনের কাজ, পেশা, চাকরি বা জীবন অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ, যা একজন ব্যক্তি তার সারা জীবনে অর্জন করে।

এবার এসো আরও একটি কাজ করি– (একক কাজ)

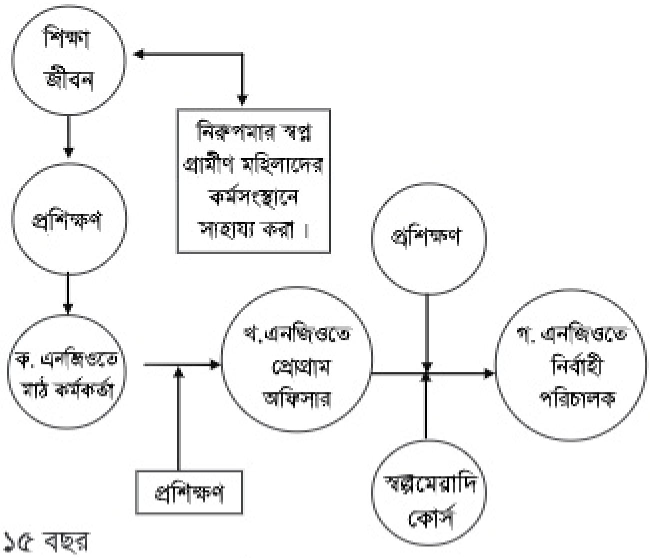

এনজিও কর্মী হিসেবে ১৫ বছর

?

নিরুপমার ২৫ বছর

?

নিরুপমার প্রতিদিন

?

প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেওয়া স্থানে নিচের বক্স থেকে শব্দ বাছাই করে বসাও ।

কাজ, ক্যারিয়ার, বৃত্তি, পেশা, চাকরি ইত্যাদি ।

চলো, একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি ।

প্রজেক্ট : আমাদের আশপাশে বিভিন্ন ধরনের পেশা ও বৃত্তির মানুষ রয়েছে। তাদের কাছ থেকে আমরা তাদের পেশা ও বৃত্তি সম্পর্কে জানতে পারি । এ প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার মানুষ খুঁজে নিয়ে তাদের কাছ থেকে সে পেশা সংক্রান্ত তথ্য জানতে চেষ্টা করব । এটি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পেশা সম্পর্কে জানতে ও ভবিষ্যতে নিজের পেশা বেছে নিতে সাহায্য করবে ।

এসো করি :

১. ক্লাসের সবাই মিলে বোর্ডে বিভিন্ন পেশার নাম লিখি । একই পেশার পুনরাবৃত্তি হলে তা মুছে যত বেশি সম্ভব নতুন পেশার নাম লেখার চেষ্টা করি ।

২. এবার ক্লাসের সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাই । প্রজেক্টের জন্য প্রত্যেক দল একটি নির্দিষ্ট পেশা বেছে নিই ।

৩. এবার চলো বিভিন্ন পত্রিকা, সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট থেকে নিচের তথ্যগুলো সংগ্রহ করি :

এই পেশার জন্য

- ➢ কী কী ধরনের চাকরির/পদের বিজ্ঞাপন রয়েছে?
- ➢ মূলত কী কী দায়িত্ব ও কাজ পালন করতে হয়?
- ➢ সাধারণত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা কী চাওয়া হয়?
- ➢ কী কী ধরনের বা কত দিনের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়?
- ➢ বেতন কাঠামো কেমন?
- ➢ নির্দিষ্ট কী কী দক্ষতার প্রয়োজন হয়?
- ➢ অন্য বিষয়াদি (যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে করো)

৪. প্রতিটি দল একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন চার্ট, ছবি, গ্রাফ, কার্টুন, পোস্টার ইত্যাদি নিয়ে আসবে। তারা নিজের কাজ শ্রেণিকক্ষের নির্দিষ্ট স্থানে প্রদর্শন করবে। সাথে সংগ্রহ করা পত্রিকা, সংবাদপত্র, বিজ্ঞপ্তি, ছবি ইত্যাদি থাকতে পারে।

৫. বিভিন্ন দল ঘুরে ঘুরে অন্যদের উপস্থাপনা দেখবে। সম্ভব হলে বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ/সপ্তম/অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানাতে পারো।

[প্রজেক্টের জন্য যদি এমন কোনো পেশা বা বৃত্তি পছন্দ কর, যার কোনো বিজ্ঞাপন খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে সেই পেশার মানুষদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো।]

তোমরা দেখে থাকবে বিভিন্ন পেশা ও চাকরিজীবীর দায়দায়িত্ব ভিন্ন। তাই তাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদিও ভিন্ন। প্রত্যেক পেশাই সমাজের জন্য উপকারী। আমাদের তাই সকল পেশার মানুষের প্রতিই শ্রদ্ধা রাখা উচিত। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ও তাদের কাজে সহায়তা করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

ক্যারিয়ারের বিকাশ

নিচে ক্যারিয়ারের কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো-

- ♦ জীবনব্যাপী একজন ব্যক্তি মূলত তার পেশা সংক্রান্ত যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন তাই তার ক্যারিয়ার। এটি বিভিন্ন চাকরি, পদ, কাজ, সম্মান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়।
- ♦ ক্যারিয়ার হলো এক বা একাধিক ধরনের চাকরি বা পেশাগত কারণে একজন ব্যক্তির জীবনের অনেকটুকু সময় জুড়ে করে থাকে।
- ♦ জীবনের সুনির্দিষ্ট কর্মময় অংশই হলো ক্যারিয়ার।

জোড়ায় কাজ

জোড়ায় জোড়ায় বসে, বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করো এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

ক্যারিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্যাপারটি স্থির কিছু নয়, বরং পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান। কারণ ক্যারিয়ারের পরিবর্তন সুশৃঙ্খলভাবে, লক্ষ্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে হওয়াই কাম্য। এজন্য আমাদের বিভিন্ন ধাপে ক্যারিয়ারের বিকাশকে এগিয়ে নিতে হবে। নিচে ক্যারিয়ার বিকাশের

বিভিন্ন ধাপ বা পরিকল্পনার পর্যায়গুলো দেওয়া হলো।

নিজেকে জানা : ক্যারিয়ারের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের আগ্রহ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, দক্ষতা বা যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে ও বুঝে প্রতিটি ধাপে অগ্রসর হতে হবে। যে কাজ আমরা করতে ভালোবাসি তেমন কাজ যদি জীবনের অধিকাংশ সময়ই করা যায় তাহলে ক্যারিয়ার আনন্দময় হয়ে ওঠে। আবার যে কাজে আমাদের আগ্রহ নেই সে কাজ করলে ভালো করার সম্ভাবনা কম থাকে।

বিভিন্ন ধরনের পেশা, বৃত্তি ও চাকরি সম্পর্কে জানা : শুধু নিজের সম্পর্কে ভালোভাবে জানলেই চলবে না। নিজের পছন্দ ও দক্ষতার সাথে মানানসই পেশা বা বৃত্তি খুঁজে বের করা ও এর জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলা ক্যারিয়ার গঠনের পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় জানাও জরুরি। জানতে হবে নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তিতে কী ধরনের চাকরি রয়েছে, সেগুলোতে কী কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় ইত্যাদি। সঠিক তথ্য আমাদের সঠিক পেশা বা চাকরি বাছাইয়ে সাহায্য করবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা : ক্যারিয়ার বিকাশে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ অপরিহার্য। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকলে বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনে এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সঠিক পরিকল্পনা করা যায়। ফলে ক্যারিয়ার গঠনে সফলতার সাথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অনেক সময় যথেষ্ট যোগ্যতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনার অভাবে ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মনে করো তুমি তোমার ক্যারিয়ারের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছ। এরপর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তোমাকে কী করতে হবে? অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার দরকার। তোমাকে সেগুলো অর্জন করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগুলো অর্জন করা যায়। এটি যে কোনো নির্দিষ্ট বৃত্তি বা পেশায় প্রবেশের জন্যই শুধু প্রয়োজন তা নয়। কোনো বৃত্তি বা পেশায় থাকাকালে সেই পেশা বা বৃত্তিতে সাফল্যের জন্য নতুন নতুন যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন।

চাকরি খোঁজা: আমরা প্রায়ই শুনে থাকি কোনো ব্যক্তি চাকরি খুঁজছেন। আবার পত্রপত্রিকায় ও ইন্টারনেটেও বিভিন্ন চাকরির বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। ব্যক্তি যখন চাকরি করতে চান তখন বিজ্ঞাপন দেখে যাচাই-বাছাই করে আবেদনপত্র জমা দেন। এজন্য যথেষ্ট মনোযোগ ও ধৈর্যের প্রয়োজন। নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, আগ্রহ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় লক্ষ রেখে সংশ্লিষ্ট চাকরির জন্য আবেদন করতে হয়। নিজের শিক্ষাগত ও পেশাগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে একজন ব্যক্তি তার জীবন বৃত্তান্ত (Curriculum Vitae বা CV) তৈরি করেন। এক্ষেত্রে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিজের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাকে তুলে ধরা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট চাকরিদাতা সংস্থা কখনো কখনো লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকে। সেক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

চাকরি পরিবর্তন : বিভিন্ন কারণে মানুষ চাকরি পরিবর্তন করে থাকে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কারণ হলো আরও ভালো কোনো চাকরির সুযোগ পাওয়া। আমরা জানি ক্যারিয়ার বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট চাকরি বা পেশা বোঝায় না বরং জীবনের পথে বিভিন্ন চাকরি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়কে বোঝায়। তাই নিজের আগ্রহ, পছন্দ, দক্ষতা ইত্যাদি পরিবর্তনের পটভূমিতে নতুন চাকরির জন্য চেষ্টা করা ক্যারিয়ারেরই অংশ।

ক্যারিয়ারের বিকাশকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন–

রৈখিক বিকাশ : ক্যারিয়ারের রৈখিক বিকাশ বলতে নিম্ন পদ থেকে ধীরে ধীরে উপরের পদে উন্নীত হওয়াকে বোঝায়। যেমন সহকারী কমিশনার পদে যোগ দেওয়ার পর ধীরে ধীরে সচিব পদে উন্নীত হওয়া।

দক্ষতাভিত্তিক বিকাশ : এক্ষেত্রে ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট কাজ বা বিষয়ে ক্রমাগত দক্ষ হওয়াকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। যেমন একজন শিক্ষকের বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ানোর ক্রমাগত চর্চার ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি এক ধরনের দক্ষতাভিত্তিক বিকাশ।

শঙ্খিল বিকাশ : ক্যারিয়ারের শঙ্খিল বিকাশ বলতে সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশকে বোঝায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। এর বাইরেও তার নানা রকম কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। ধরা যাক, একজন বিজ্ঞান শিক্ষক বিজ্ঞান ছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিলেন। এরপর তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে অন্য একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেন। এভাবে তার ক্যারিয়ারের শঙ্খিল বিকাশ শুরু হয়।

গতিময় বা চলমান বিকাশ : এক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্যারিয়ারে ক্রমাগত পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন। এ পরিবর্তন চলমান। ধরা যাক, সেই বিজ্ঞান শিক্ষক এবার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আরেকটি চাকরি নিলেন। সেটি পরিবর্তন করে কয়েক বছর পর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ালেখা করে একটি গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। এই যে তার ক্যারিয়ারের বিভিন্নমুখী পরিবর্তন, একেই বলে ক্যারিয়ারের গতিময় বা চলমান বিকাশ।

মনে রাখা প্রয়োজন, একজন ব্যক্তির জীবনে ক্যারিয়ারের সব ধরনের বিকাশই সম্ভব। তবে কখনো কখনো একটি নির্দিষ্ট ধারা লক্ষ করা যায়।

ক্যারিয়ারের রূপরেখা বা মডেল

মনোবিজ্ঞানী ডোনাল্ড সুপার সময়ের সাথে সাথে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের ভিত্তিতে একটি মডেল তৈরি করেছেন। এটিকে Life Rainbow বলা হয়েছে কারণ এর ধাপগুলোকে রংধনুর মতো ধাপে ধাপে সাজানো যায়।

ধাপ	বৈশিষ্ট্য
প্রথম ধাপ : বৃদ্ধি	নিজের সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়; দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা এবং কাজের একটি সাধারণ জগৎ সম্পর্কে ধারণা হয়।
দ্বিতীয় ধাপ : অনুসন্ধান	বিভিন্ন কাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। পছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা অর্জন।
তৃতীয় ধাপ : স্থিতি	কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী অবস্থানে পৌছানো।
চতুর্থ ধাপ : বজায় রাখা	নিজের অবস্থানের উন্নতির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও পরিবর্তন, খাপ খাওয়ানো।
পঞ্চম ধাপ : প্রতিফলন	ফলাফল বা প্রাপ্তি কমে আসা, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি।

১০১৮

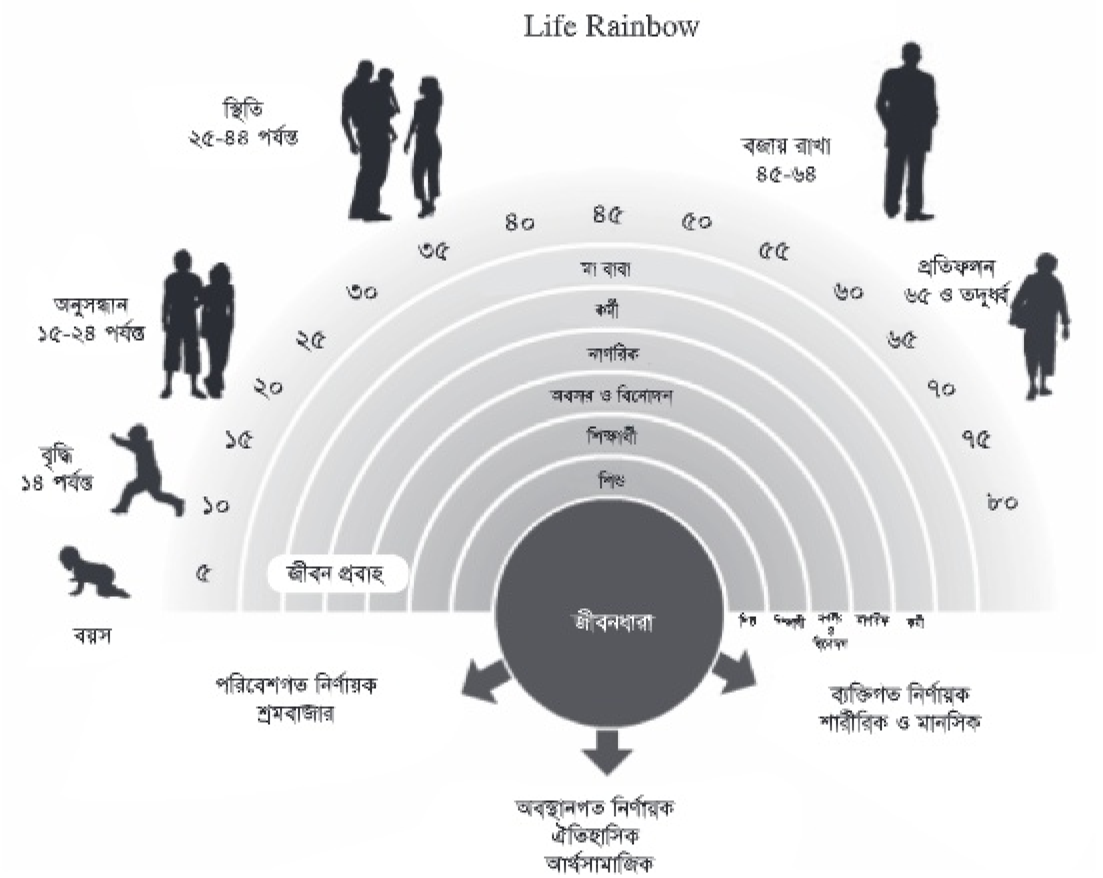

যদিও ডোনাল্ড সুপার তার পর্যায় বা ধাপগুলোকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করেছেন, তবে এই ধাপ বিভাজন ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হতে পারে।

প্রজেক্ট

১. প্রত্যেকে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রজেক্টের জন্য বেছে নেব যিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরে গেছেন বা খুব শীঘ্রই যাবেন। এবার তার জন্মকাল থেকে এ পর্যন্ত জীবন ইতিহাস জানতে সাক্ষাৎকার নেব। প্রয়োজনে একাধিকবার সাক্ষাৎকার নিতে হবে।

২. এবার তার একটি প্রোফাইল তৈরি করি। অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত তথ্য বৃহত্তর পরিসরে দিতে নাও পারেন। তাই আমরা ছদ্মনাম ব্যবহার করব। প্রোফাইলটিতে আমরা ব্যক্তির জীবনী বছর অনুযায়ী অথবা বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজাতে পারি। এতে নিচের তথ্যগুলো যেন থাকে তা লক্ষ রাখতে হবে :

ব্যক্তির নাম (ছদ্মনাম)

- লিঙ্গ
- জন্মকাল ও জন্মস্থান
- শিক্ষাজীবন
- কর্মজীবন
- ব্যক্তিগত জীবন
- অবসরজীবন (যদি থাকে)
- ক্যারিয়ারে কী কী ধাপ সফলভাবে পার করেছেন?
- কী কী বিষয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন? তা থেকে কীভাবে বেরিয়ে এসেছেন?
- এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা অন্যরকম হলে ভালো হতো মনে করেন?
- অন্য কোন কোন বিষয় ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে?
- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

এবার ব্যক্তির জীবনটিকে মডেলের সাথে তুলনা করে দেখো। প্রয়োজন হলে তুমি তোমার মতো করে নতুনভাবে ধাপ নির্ধারণ করে তার জীবনধারা বর্ণনা করো।

প্রত্যেকে তাদের প্রজেক্টটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ক্যারিয়ার শিক্ষার গুরুত্ব

আমরা ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে একটু একটু করে জানছি। কখনো চিন্তা করেছ কেন আমরা এই বিষয়টি পড়ছি? এটি পড়ার কারণে আমাদের জীবনে কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে বা হতে পারে? চলো, একটু ভেবে দেখি।

কাজ :

শ্রেণিকক্ষের ৪টি দেয়ালে ৪টি বড় কাগজ/পোস্টার পেপার আটকে দাও। তাতে লেখা থাকবে–

ক্যারিয়ারের শিক্ষা আমাদের জীবনে কীভাবে কাজে লাগছে	ক্যারিয়ারের শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কী কাজে লাগতে পারে	এই বিষয় থেকে নতুন কী কী শিখেছি	নতুন কী কী বিষয় জানা দরকার

প্রতিটি দেয়ালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনে একাধিক কাগজ/পোস্টার পেপার থাকতে পারে। প্রত্যেকে ঘুরে ঘুরে আটকানো পেপারের কাছে গিয়ে চিন্তা করে সংক্ষেপে ১টি বা ২টি করে পয়েন্ট বা বিষয় লিখবে। প্রত্যেকের লেখা শেষ হলে সবাই মিলে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা করে বের করি, ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের জীবনে কীভাবে কাজে লাগছে এবং ভবিষ্যতে লাগতে পারে। আমরা এই বিষয় থেকে নতুন কী কী জানতে ও শিখতে পারি।

দেখলে তো ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের জীবনে কী কী কাজে লাগে। তাই আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আলাদা বিষয় হিসেবে ক্যারিয়ার সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা আর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক মানুষই চায় একটি সুন্দর ও সফল ক্যারিয়ার। তাই এটি সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে আমরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ক্যারিয়ার গঠনে আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। যেমন আমি কোন বিভাগে পড়ব অথবা ভবিষ্যতে কোন পেশা বা বৃত্তি বেছে নেব ইত্যাদি। প্রতিটি সিদ্ধান্তই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনযাপন শৈলী, মান, উপার্জন, জীবনের গতিময়তা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে। আমাদের এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত শুধু নিজের জীবন নয় পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়কেও প্রভাবিত করতে পারে। যেমন– আমরা বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই যদি বিজ্ঞান শাখায় পড়ি এবং এই সংক্রান্ত পেশায় নিযুক্ত হই তবে সমাজ এক রকম হবে, আর বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই যদি মানবিক শাখায় পড়ি ও এই সংক্রান্ত চাকরি করি তাহলে সমাজ হবে আরেক রকম। আবার যদি বিশ্ববাজারে বিজ্ঞান শাখা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর চাকরি থাকে, যা দেশে নেই তখন অনেকে হয়তো ভালো চাকরির সন্ধানে অন্যান্য দেশে চলে যেতে পারে। আবার পুরো ব্যাপারটাকে উল্টোভাবেও দেখা যায়। যেমন– বহির্বিশ্বে চাকরির বাজার, দেশে চাকরির পরিস্থিতি, সমাজের চাহিদা ইত্যাদি লক্ষ করেও অনেক সময় মানুষ শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা বা শাখা বেছে নেয়। কাজেই আমরা বিশ্ব, সমাজ, পরিস্থিতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আবার আমাদের সিদ্ধান্তের ওপর বিশ্ব, সমাজ, পরিস্থিতি ইত্যাদিও নির্ভরশীল। যেহেতু ক্যারিয়ার-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই চিন্তা-ভাবনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

এখানে আরেকটি বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সম্পুর্ণভাবে আমাদের নিজের হাতে নাও থাকতে পারে। যেমন– অনেক সময় নির্ধারিত শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট শাখা বা বিভাগ বরাদ্দ হতে পারে। তাই এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আগে থেকেই সতর্ক থেকে কর্মপন্থা নির্ধারণ করাও এক ধরনের সিদ্ধান্ত। আমি যদি জানি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির জন্য আমাকে বিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে ৭০% নম্বর পেতে হবে এবং আমার লক্ষ্য যদি হয় বিজ্ঞান বিভাগে পড়া তবে এ বিষয়টি ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। মনে রাখা দরকার, লক্ষ্য পূরণ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে লক্ষ্য পরিবর্তন করা যেতে পারে।

শেখার জন্য অনুপ্রেরণা

ক্যারিয়ার শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যখন বিভিন্ন বিষয় থেকে কোনো একটি নির্বাচন করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো শেখার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। ক্যারিয়ার শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যা শিখছি তা কীভাবে আমাদের কাজে লাগছে এবং ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এই অনুধাবন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায় এবং অনুপ্রেরণা তৈরি করে।

সমাজজীবনে কর্ম ও পেশার চাহিদা

সমাজের জন্য সকলের কাজ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বৃত্তি, চাকরি ও পেশার মধ্য দিয়ে সমাজে মানুষ উপার্জন

করে জীবনধারণ করে। সমাজের বিভিন্ন চাহিদা যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য মানুষ সমাজে নানা ধরনের কাজ করে। কেউ নিজের বা পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য, কেউ আত্মতৃপ্তির জন্য কাজ করে। কাজ মানুষের জীবনে প্রয়োজন মেটায়, তৃপ্তি আনে। এতে সমাজও লাভবান হয়। ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের তুলনামূলকভাবে পছন্দের কাজ বেছে নিতে ও সফল হতে সাহায্য করে। কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনেও এটি সাহায্য করে।

পরিবর্তনশীল কাজের ধরন সম্পর্কে ধারণা

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় কাজের চাহিদা ও সুযোগের পার্থক্য রয়েছে। আবার কাজের এই চাহিদা সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনশীল চাহিদা সম্পর্কে জানতে এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে বিভিন্ন জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের সহায়তা করে।

উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ

যতই দিন যাচ্ছে ততই বিভিন্ন কাজে আগের চেয়ে বেশি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হচ্ছে। যেকোনো ধরনের কাজের জন্যই ন্যূনতম পর্যায়ের ভাষা দক্ষতা, বিশেষ করে মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, উপার্জনের জন্য অনুপ্রেরণা, সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় এবং ক্যারিয়ার শিক্ষার ধারণা শিক্ষার্থীকে এই যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি

প্রতিটি চাকরি বা পেশার জন্য নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট বিষয়ে লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা এই দক্ষতাগুলো অর্জন করি। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে কিছু সাধারণ দক্ষতা যেমন– বিভিন্ন মানুষের সাথে একত্রে কাজ করা, অন্যকে সাহায্য করা, ইত্যাদি দক্ষতার পাশাপাশি মনোযোগ, ধৈর্য, কাজের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণও থাকা দরকার হয়। ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা দেয়।

পরিকল্পনা করতে উদ্বুদ্ধকরণ

ক্যারিয়ার শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা করতে শেখায়। এটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা শুধু শিক্ষা, বৃত্তি বা কর্মক্ষেত্রের পরিকল্পনাই করি না, বরং বৃহৎ অর্থে জীবনেরই পরিকল্পনা করি। এটি কখনোই স্থির বা নিশ্চিত নয় বরং পরিবর্তনশীল। তবে পরিকল্পনা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, কোন পথে কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তা নির্ধারণ করে। সঠিক পরিকল্পনা অনেক সমস্যার সমাধান দেয়।

সংবেদনশীলতা তৈরি

ক্যারিয়ার শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম, পেশা ও পেশাজীবী মানুষ সম্পর্কে জানতে পারি। তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখি। এটি আমাদের বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিযুক্ত মানুষের প্রতি সহনশীল, সহমর্মী ও সংবেদনশীল হতে শেখায়।

দলগত কাজ : ছোট দলে নাটিকা বা ভূমিকাভিনয়

প্রত্যেকটি দল ক্যারিয়ার শিক্ষার গুরুত্বের একটি পয়েন্ট বেছে নাও। এবার একটি কেস, ঘটনা বা গল্প তৈরি করো যাতে সুষ্ঠুভাবে ক্যারিয়ার শিক্ষার নির্দিষ্ট গুরুত্বটি ফুটে ওঠে। এবার শ্রেণিতে সেটি অভিনয় করে দেখাও।

[যেমন– একটি মেয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে ক্যারিয়ার বিষয়ে জেনেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে সে প্রতিটি পেশার মানুষের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী। সে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের সিগনাল মেনে স্কুলে যাচ্ছে। স্কুলের শিক্ষকদের ছাড়াও দপ্তরি, মালী, দারোয়ান সবাইকে সম্মান করছে, তাদের কাজে সাহায্য করছে ইত্যাদি। মেয়েটির সারাদিনের একটি চিত্র অভিনয় করে দেখানো যায়।]

আমি, আমার শিক্ষা ও ক্যারিয়ার

আমরা যে নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার বেছে নিতে চাই, তার জন্য নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। আবার যে বিষয়গুলো শিখতে ভালো লাগে বা আমি যেটিতে বেশি পারদর্শী, তার ভিত্তিতে আমার ক্যারিয়ার নির্ধারণ হয়। নিজের পছন্দ, আগ্রহ, চাহিদা, ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিবেচনা সাপেক্ষে আমরা তুলনামুলকভাবে একটি উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র খুঁজে বের করতে পারি। এজন্য আমাদের নির্দিষ্ট শিক্ষা এবং কখনো কখনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেককে ধাপে ধাপে–

- নিজেকে জানতে হবে (নিজের সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে)
- বিভিন্ন ধরনের কর্ম, পেশা বা চাকরি সম্পর্কে জানতে হবে
- পরবর্তী পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে হবে
- করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

এসো নিচের কাজগুলোর মধ্য দিয়ে ধাপগুলো পার হই।

ক। আমার শখ, অন্যান্য কাজ ও অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে নিচের ছকটি পূরণ করি:

আমি যে যে কাজ করেছি	যে বিষয়ে আমি দক্ষ	যে কাজগুলো করতে আমি পছন্দ করি	যে কাজগুলো করতে আমার আগ্রহ কম
যেমন– উপস্থাপন, রান্না, কবিতা লেখা------	যেমন– বক্তৃতা---	যেমন– দলে কাজ করা, বাগান করা-----	যেমন– একক উপস্থাপন--

এবার একইভাবে স্কুলের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিষয়গুলো কেমন হবে তা চিন্তা করে লেখো:

আমি এ পর্যন্ত যে যে বিষয় পড়েছি	যে বিষয়গুলোতে আমি দক্ষ	যে বিষয়গুলো আমি পছন্দ করি	যে বিষয়গুলোতে আমার আগ্রহ কম
	যেমন– বাংলা----------	যেমন– বিজ্ঞান----------	

তুমি যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও কাজকর্মের কথা উল্লেখ করেছ তার মধ্যে কোনগুলো তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দদায়ক?

এই অভিজ্ঞতা বা কাজগুলোর মধ্যে কি কোনো মিল রয়েছে? যেমন–বেশির ভাগ কাজই যন্ত্রপাতি দিয়ে করতে হয়। এরকম কোনো মিল থাকলে তা উল্লেখ করো :

এই ছকগুলো পূরণ করতে ও চিন্তা করার সময় এমন কোনো মূল্যবোধ, আদর্শ বা বিষয় কি তোমার মাথায় এসেছে যা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ? যেমন– কাজের মান বজায় রাখা, পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া ইত্যাদি। চিন্তা করে লেখার চেষ্টা করো:

তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে কী শিখলে তা সংক্ষেপে লেখো (তোমার পছন্দ, অপছন্দ, আগ্রহ, মূল্যবোধ ইত্যাদি)।

খ। এবার ভবিষ্যতে একটি পেশা/কাজ/চাকরি/বৃত্তিতে নিজেকে কর্মরত কল্পনা করে নিচের বক্সে একটি ছবি আঁকো।

ছবির নাম : যখন আমি একজন---------------------------

এ ধরনের আরও কিছু কাজ বা পেশা খুঁজে বের করি। এগুলো বিকল্প পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করতে পারে।

তোমার সবচেয়ে পছন্দের ৩টি বৃত্তি বা পেশার কিছু সুবিধা বা আকর্ষণের কারণ এবং অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জগুলো চিন্তা করে ছকটি পূরণ করো।

বৃত্তি বা পেশা	এটি আকর্ষণীয়, কারণ–	এই বৃত্তি বা পেশায় যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হতে পারে–
১		
২		
৩		

প্রতিটি কাজের জন্য (পছন্দের ক্রমানুযায়ী ৩টি) কী কী প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা জানার চেষ্টা করি ও লিপিবদ্ধ করি:

১ ।

............................:..

২ ।

............................:..

৩ ।

............................:..

এবার এসো চিন্তা করি, যে যোগ্যতা, দক্ষতা, শিক্ষা, ডিগ্রি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে তা কীভাবে অর্জন করা সম্ভব?

....

....

চিন্তা করি আমার কি এই কাজের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ও আকর্ষণ রয়েছে যে আমি এর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করব?

আমার প্রথম পছন্দের পেশায় নিয়োজিত একজনকে চিহ্নিত করি। অতঃপর তার অনুমতি নিয়ে একদিন তার সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করি। একটি ডায়েরিতে সবকিছু লিখে রাখি। জানতে চেষ্টা করি–

- এই কাজের জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন?
- কাজটিতে কী কী সুবিধা রয়েছে?
- কাজটি করতে কী কী অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে?
- কীভাবে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যায়?

[বেশির ভাগ বিষয়ই তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা না করে তার আচরণ ও কাজকর্ম দেখে বিশ্লেষণ করে বের করার চেষ্টা করি।]

গ। যে ৩টি পেশা বা কাজ নির্ধারণ করেছি, এবার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ঘেঁটে, শিক্ষক ও অন্যদের সাথে আলোচনা করে, এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিই। এক্ষেত্রে আমার কোন দক্ষতাটি কতটুকু আছে তা নির্ধারণ করে ছকটি পূরণ করি।

পেশা	যোগ্যতা ও দক্ষতা	কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন	কতটুক অর্জন করেছি	আর কী কী করা প্রয়োজন
পেশা ১	শিক্ষাগত যোগ্যতা			
	অভিজ্ঞতা			
	প্রশিক্ষণ			
পেশা ২	শিক্ষাগত যোগ্যতা			
	অভিজ্ঞতা			
	প্রশিক্ষণ			
পেশা ৩	শিক্ষাগত যোগ্যতা			
	অভিজ্ঞতা			
	প্রশিক্ষণ			

ঘ। যে যে বিষয়ে আমার আরও যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করতে হবে, সেগুলো কীভাবে করতে পারি তা নিয়ে চিন্তা করি। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও অন্যদের সহায়তা নিতে পারি।

আরও কিছু বিষয় চিন্তা করে দেখি :

- আমার যে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা, যা যা এর মধ্যে শেখার কথা তা কি শিখতে পেরেছি?

....

- পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি?

....

- নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনে কী ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারি যা আমাকে সাহায্য করবে?

....

- আমার পড়ার ক্ষেত্রে কি কোনো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? কী ধরনের পরিবর্তন?

....

কর্মজগৎ ও আমি

আমরা প্রায়ই বিভিন্ন পেশা, বৃত্তি বা নির্দিষ্ট চাকরিতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখি। কখনো হয়তো সেটি পূরণ হবে। তবে কর্মে প্রবেশ করলেই শুধু হয় না। কীভাবে সাফল্যের সাথে কর্মজগতে বিচরণ করা যায় তাও কিন্তু চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা আগেই জেনেছি বিভিন্ন ধরনের পেশা বা কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

একক কাজ

তোমার পছন্দের কাজ বা পেশাটির জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো নির্ধারণ করার চেষ্টা করো। নির্ধারণ করার পর তা একটি গল্প/কবিতা/গান/ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করো (বা অন্য কোনো মাধ্যমে)।

আমার পছন্দের পরিবর্তন

আমরা যা যা পরিকল্পনা করছি তা যথেষ্ট নমনীয় হওয়া দরকার। আমাদের ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদির পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। যদি ইচ্ছা, আগ্রহের পরিবর্তন হয় তবে সে অনুযায়ী ক্যারিয়ারের পরিকল্পনাও পরিবর্তিত হতে পারে। এর মধ্যে তোমার কী ধরনের পছন্দ, অপছন্দ, চাহিদা, আগ্রহ, মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে চিন্তা করে লিখে রাখো–

আগে আমি	এখন আমি	পরিবর্তনের কারণ ....
....	....	....
....	....	....

দেখলে তো মানুষের চিন্তার পরিবর্তনের সাথে সাথে আগ্রহ, পছন্দ, চাহিদা ইত্যাদিরও পরিবর্তন হয়। তুমি কি এমন কাউকে চেন যার পছন্দের শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি পরিবর্তন হয়ে অন্য রকম হয়েছে? থাকলে দলগত আলোচনায় সবাইকে জানাও। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্বাভাবিক ব্যাপার। পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। এজন্য পরিকল্পনায় নমনীয়তা থাকলে তা পরিবর্তন করা সহজ হয়।

আমার আগ্রহ, যোগ্যতা ও মূল্যবোধ

আমি ভবিষ্যতে কোন ধরনের কাজ করব বা করতে চাই তা বোঝার জন্য নিজের আগ্রহ, যোগ্যতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ক্যারিয়ার নির্ধারণে 'আগ্রহ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে সে বিষয় পড়তে এবং সে সংক্রান্ত কাজ করতে আমরা অনুপ্রাণিত হই। আগ্রহ না থাকলে অনেক বিষয়ই একঘেয়ে মনে হয়। যথেষ্ট আগ্রহ না থাকার কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক কাজে মানুষের সাফল্য নাও আসতে পারে।

এসো একটি পরীক্ষা করে দেখি। এটি শুধু আনন্দের জন্য। এটি আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেবে। প্রথমে নিচের ছকে দেওয়া মন্তব্যগুলো পড়ো। প্রতিটি মন্তব্য তোমার ক্ষেত্রে কতটুকু সত্য তার ভিত্তিতে মন্তব্যের পাশে যেকোনো একটি ঘরে টিক চিহ্ন দাও: মনে রাখবে এখানে ভুল বা সঠিক বলে কিছু নেই।

এবার নম্বর দেওয়ার পালা। নিচের ছকে আট ধরনের ব্যক্তিত্বকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি ঘরের উপরের সারিতে যে নম্বরগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো মন্তব্যের নম্বর যেমন– সম্পূর্ণ ভিন্নমত-০, ভিন্নমত-১, নিরপেক্ষ-২, একমত-৩, সম্পূর্ণ একমত-৪। মন্তব্যগুলোতে তোমার পাওয়া নম্বর ছকে বসিয়ে যোগ করো।

ক্রম	মন্তব্য	সম্পূর্ণ ভিন্নমত ০	ভিন্নমত ১	নিরপেক্ষ ২	একমত ৩	সম্পূর্ণ একমত ৪
১	আমি আমার বেশির ভাগ অবসর সময় বাসার বাইরে কাটাই					
২	আমি যুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করি					
৩	আমি পড়তে বেশ ভালোবাসি					
৪	মানুষ আমাকে সৃজনশীল বলে থাকে					
৫	আমি হাতে-কলমে কাজ করতে ভালোবাসি					
৬	আমি ঘরের বাইরে কাজ করতে পছন্দ করি					
৭	আমি বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধান করে আনন্দ পাই					
৮	আমি শব্দজট, শব্দের খেলা, ধাঁধা পছন্দ করি					
৯	আমার মাথায় নতুন নতুন ধারণার জন্ম হয়					
১০	আমি হাতে-কলমে কাজ করে আনন্দ পাই					
১১	আমি সব সময় বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করতে ভালোবাসি					
১২	আমি মানুষের সান্নিধ্য ভালোবাসি					
১৩	আমি কোনো বিষয়ে আমার নিজের অবস্থান বোঝাতে পছন্দ করি					
১৪	তথ্য ও উপাত্তকে সাজাতে ও শ্রেণিবিন্যাস করতে ভালোবাসি					
১৫	আমি অন্যকে পরামর্শ দিতে পছন্দ করি					
১৬	আমি আমার চিন্তাধারা লিখে প্রকাশ করতে পছন্দ করি					
১৭	আমি বিভিন্ন নকশা বা ডিজাইন তৈরি করতে পছন্দ করি					
১৮	অন্যের সমস্যা সমাধান করতে আমার ভালো লাগে					
১৯	আমি উদ্যোগ নিতে পছন্দ করি					
২০	আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন আমি ঘরের বাইরে থাকতে পছন্দ করি					
২১	বিভিন্ন জিনিস তৈরি ও মেরামত করতে আমার ভালো লাগে					
২২	আমি তথ্য ব্যবহার করতে ও সাজাতে পছন্দ করি					
২৩	যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে আমার ভালো লাগে					
২৪	কোনো ঘটনা ঘটার পেছনের কারণ জানতে আমার ভালো লাগে					
২৫	আমি প্রতিযোগিতার চেয়ে জিততে পছন্দ করি					
২৬	আমি সংগীত, কলা বা নাটক বেশ ভালোবাসি					
২৭	আমি অন্যদের সাথে আমার ধারণা নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতে ভালোবাসি					
২৮	আমি বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের মধ্য থেকে ধারা বা প্যাটার্ন বা সম্পর্ক খুঁজে বের করতে ভালোবাসি					
২৯	আমি অনেক সময় খেলাধুলায় ব্যয় করি					
৩০	আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব নিতে পছন্দ করি					
৩১	আমি অন্যদের সাহায্য করে আনন্দ পাই					
৩২	আমি তথ্য উপস্থাপনের জন্য সারণি ও লেখচিত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করি					

উদাহরণ হিসেবে, তুমি কতটা বহির্মুখী তার জন্য তুমি ১, ৬, ২০, ও ২৯ নম্বর মন্তব্যগুলো বিবেচনা করবে। ধরা যাক তুমি ১, ৬, ২০, ২৯ নম্বর মন্তব্যে যথাক্রমে একমত, সম্পূর্ণ একমত, সম্পূর্ণ একমত ও নিরপেক্ষ ঘরে টিক দিয়েছ। তাহলে বহির্মুখী ঘরের জন্য তোমার স্কোর হবে ৩+৪+৪+২ = ১৩। এভাবে নিচের মোট আট ধরনের ব্যক্তিত্বের ঘরে নম্বর দেওয়া শেষ হলে দেখতে হবে তোমার নম্বর কোনটিতে বেশি। তোমার নম্বর যেদিকে বেশি সেদিকে তোমার ঝোঁক বা প্রবণতা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ব্যক্তিত্ব	শিল্পী সুলভ		ব্যবস্থাপনা		সাহিত্যানুরাগী		বহির্মুখী		ব্যবহারিক		তথ্য ব্যবহার		বৈজ্ঞানিক		সামাজিক	
	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর	বক্তব্যের ক্রম	প্রাপ্ত নম্বর
	৪		১৩		৩		১		৫		১৪		২		১২	
	১১		১৫		৮		৬		১০		২২		৭		১৮	
	১৭		১৯		৯		২০		২১		২৮		২৩		২৭	
	২৬		৩০		১৬		২৯		২৫		৩২		২৪		৩১	
মোট																

আমার যোগ্যতা ও দক্ষতা

এসো দেখি এমন কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতা যা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

লেখার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন
মৌখিক যোগাযোগ
দলে কাজের যোগ্যতা
আত্মসচেতনতা
সংখ্যা জ্ঞান বা গাণিতিক দক্ষতা
সমস্যা সমাধান বা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ
নেতৃত্ব
তাড়না, প্রেরণা, সক্রিয়তা
নমনীয়তা
পেশাদারি মনোভাব
ব্যবসায়িক সচেতনতা
হিসাব-নিকাশ
পরিকল্পনা ও সংগঠিত করা
সময়নিষ্ঠা

এই যোগ্যতা ও দক্ষতার কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলো:

যোগাযোগ

যোগাযোগ বলতে আমরা বুঝি স্পষ্টভাবে বলা, শোনা, বোঝা এবং লেখা। বিভিন্ন ধরনের পাঠক অনুযায়ী সঠিকভাবে লিখে উপস্থাপন করা, অন্যকে প্রভাবিত করা, মধ্যস্থতা করা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ক্ষমতা, তথ্য আদানপ্রদান, ধারণা উপস্থাপন করার যোগ্যতা, সাবলীলভাবে কথা বলার দক্ষতা, যৌক্তিকভাবে তথ্যের সারাংশ উপস্থাপনার ক্ষমতা ইত্যাদি।

দলে কাজ করা

দলে কাজ করা বলতে বোঝায় বয়স, নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে বিভিন্ন মানুষের সাথে একত্রে কাজ করা। দলের সদস্যদের ভালো গুণ সম্পর্কে ধারণা থাকা, নিজের গুণাবলি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা, দলের লক্ষ্যকে সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরা এবং ঐকমত্য কাজ করা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দলে কাজ করার আরও যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হলো নেতৃত্ব দেওয়া, অন্যদের পরামর্শ দেওয়া, অনুপ্রেরণা জোগানো, বিভিন্ন মতামতকে শ্রদ্ধা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানো, সাফল্য অর্জনে দলগতভাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

সমস্যা সমাধান

আমাদের জীবনে সব সময়ই কোনো না কোনো সমস্যা সমাধান করতে হয়। যে ব্যক্তি সমস্যা সমাধানে যত পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক সে তত বেশি সফল হয়। নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারলে সাফল্য লাভ সম্ভব।

- তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ
- অনুমান পরীক্ষা বা যাচাই করা
- সমস্যাকে চিহ্নিত এবং এর পেছনের কারণ খুঁজে বের করা
- সৃজনশীল, উদ্ভাবনী ও কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা
- সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পন্থা কাজে লাগানো
- বিকল্প পরিকল্পনা রাখা
- বিভিন্ন গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করা

কর্মক্ষেত্রে মূল্যবোধ

সাবিহা একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করেন। একটি নতুন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও অন্য ফলাফলসহ একটি রিপোর্ট এসেছে। এ বিষয়ে সকল তথ্য-উপাত্ত একটি সেমিনারে উপস্থাপন করা তার দায়িত্ব। হঠাৎ তার তত্ত্বাবধায়ক তাকে একটি নোট পাঠালেন। তাতে লেখা সে যেন একটি নির্দিষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া উল্লেখ না করে তা উপস্থাপন করেন। সাবিহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। এটা কি তার করা উচিত ?

তোমরা দলে বসে চিন্তা করো–

১. সাবিহার সামনে কী কী পথ রয়েছে?

২. প্রতিটি সিদ্ধান্তের সুবিধা ও অসুবিধা অর্থাৎ ফলাফল আলোচনা করো।

উপরের ঘটনাটির মতো কর্মক্ষেত্রে অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যখন আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়, কী করা উচিত কী করা উচিত নয় তা আমরা ভাবি। এই উচিত বিষয়টিই মূল্যবোধ। তোমরা যখন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছ তখনো নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে এই মূল্যবোধ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে। আবার কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে মূল্যবোধ সংক্রান্ত শর্ত দেওয়া থাকে যা সবাই মেনে

চলবে বলে আশা করা হয়। কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধের সাথে আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জিত হয়। যেমন–

১. এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকা যেটি আমি করতে চাই।

২. এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকা যেটি করার অধিকার আমার রয়েছে।

[যেমন– আমি বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চাই কিন্তু এজন্য অনৈতিক কিছু করতে হলে আমি ঐ প্রতিষ্ঠানে কাজ করব না]

এমন আরও কয়েকটি উদাহরণ খুঁজে বের করো।

মূল্যবোধের সাথে আরও কিছু বিষয় জড়িত। যেমন– বিশ্বাস, সততা, নিষ্ঠা, আনুগত্য ইত্যাদি।

দলগত কাজ

চারটি দলে ভাগ হয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করো। সাবিহার মতো নির্দিষ্ট একটি ঘটনা বা গল্প তৈরি করো যাতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধের উভয় সংকট প্রকাশ পায়।

আমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার

ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দল একজন করে ব্যক্তি চিহ্নিত করো (পরিচিত, আত্মীয়) যারা তাদের স্বপ্নের ক্যারিয়ার গঠন করতে পেরেছে বলে মনে করো। তাদের সাক্ষাৎকার নাও এবং একটি ছোট ম্যাগাজিন তৈরি করো (হাতে তৈরি)।

মলাটে তার ছবি ও একটি চমৎকার শিরোনাম দাও। ভিতরে তার ছবিসহ বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করো। তার স্বপ্ন, শিক্ষাজীবন, আগ্রহ, মূল্যবোধ, বিশেষ যোগ্যতা, চাকরিজীবন, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য দিয়ে ম্যাগাজিনটি সাজাও।

এক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারের চেষ্টা করো। পৃষ্ঠাগুলো স্টেপলার, স্কচটেপ বা আঠা দিয়ে এক সঙ্গে জুড়ে দাও। প্রয়োজন মতো রঙ করো।

অ্যাসাইনমেন্ট

পোস্টার তৈরি

তোমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার কী তা কি তুমি এখন বুঝতে পেরেছ? তোমার আগ্রহ, যোগ্যতা ও মূল্যবোধ বিচার করে নিশ্চয়ই তুমি কিছুটা বুঝতে পারছ। নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে একটি পোস্টার তৈরি করো।

আমার আগ্রহ	আমার যোগ্যতা বা দক্ষতা	আমার মূল্যবোধ
আমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার	এই পথে পৌঁছানো : উপায়/ধাপ	কিছু ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ

তোমার নিজের ছবি, বিভিন্ন পেপার কাটিং, মডেল, চার্ট ইত্যাদি যুক্ত করতে পারো।

ক্যারিয়ারের সাথে আগ্রহ, যোগ্যতা ও মূল্যবোধের সম্পর্ক

- আমি কী করতে পছন্দ করি?
- আমি কী করতে পারি?
- আমার কী করা উচিত বলে আমি মনে করি?

এগুলো যথাক্রমে আগ্রহ, যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং মূল্যবোধ নির্দেশ করে। আমি যা করতে পছন্দ করি তা করার দক্ষতা আমার নাও থাকতে পারে। তবে সচরাচর যা আমরা পছন্দ করি তা বেশি করে চর্চার কারণে দক্ষতা গড়ে উঠে। পছন্দ-অপছন্দ ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্যারিয়ার হলো জীবনব্যাপী। আগ্রহ না থাকলে কোনো বিষয় নিয়েই বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না, সফলতাও আসে না।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি :

আগ্রহ-মূল্যবোধ : যা আমার করতে ভালো লাগে, তা কি সব সময়ই করা উচিত বা নৈতিক?

দক্ষতা-আগ্রহ : কোনো বিষয়ে আমার দক্ষতা থাকলেই কি আমার আগ্রহও থাকবে?

দক্ষতা-মূল্যবোধ : যে কাজে দক্ষতা রয়েছে সেটি কি সব সময়ই নৈতিক?

মূল্যবোধ-আগ্রহ : যা করা উচিত তাতে কি সবসময়ই আগ্রহ থাকে?

মূল্যবোধ-দক্ষতা : যা করা উচিত সে বিষয়ে কি সব সময় দক্ষতা থাকে?

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাধারণভাবে যেকোনো কিছু করাকে কী বলে?

ক. বৃত্তি
খ. কাজ
গ. পেশা
ঘ. ক্যারিয়ার

২. সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাগান পরিচর্যাকারীর পদটি কোন ধরনের?

ক. ক্যারিয়ার
খ. পেশা
গ. বৃত্তি
ঘ. চাকরি

৩. ক্যারিয়ার বিকাশ হলো:

i. একটি সরলরৈখিক পরিবর্তন
ii. মূলত চাকরির পরিবর্তন
iii. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i গ. ii
খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

লাবনীর জন্ম ফরিদপুরের একটি পল্লিতে। গ্রামে থাকাকালে সে নানা ধরনের দুষ্টুমিতে মেতে থাকত। মা-বাবা বা গুরুজনদের কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বা কোনো কাজ দিলে তা এড়িয়ে যেত। মেয়ের মঙ্গল কামনায় মা-বাবা ঢাকায় মামার বাসায় তাকে লেখাপড়া করতে পাঠান। তিন বছর পর গ্রামে বেড়াতে গেলে লাবনীর আচরণের পরিবর্তন দেখে সবাই বিস্মিত হয়।

৪. লাবনীর ক্ষেত্রে আচরণের কোন দিকটির পরিবর্তন ঘটেছে?

ক. মানবিক খ. দৃষ্টিভঙ্গি
গ. সৌহার্দপূর্ণ ঘ. শ্রদ্ধাবোধ

৫. লাবনীর আচরণে পরিবর্তিত দিকটির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো, এটি−

i. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ভেদে ভিন্ন হতে পারে
ii. ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচকও হতে পারে
iii. কখনো পরিবর্তনযোগ্য নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ফাহিম চৌধুরী ছোটবেলা থেকেই তার ক্যারিয়ার গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। সে লক্ষ্যে তিনি ব্যবসায় শিক্ষা শাখা বেছে নেন। পরবর্তী সময়ে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে তিনি একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ হিসেবে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে দক্ষতা, মেধা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি এখন ওই কোম্পানিরই একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

ক. ক্যারিয়ার কী?
খ. ক্যারিয়ার শিক্ষা পাঠের অন্যতম একটি গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
গ. ফাহিম চৌধুরীর কাজটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ফাহিম চৌধুরীর ক্যারিয়ার বিকাশে কোন বিষয়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তা বিশ্লেষণ করো।

২০১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠন: গুণ ও দক্ষতা

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে নবম-দশম শ্রেণিতে লেখাপড়া করার সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। আমরা ইতোমধ্যে জীবনে কে কোন ধরনের ক্যারিয়ার গড়ব সে বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরই আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার কীভাবে সুগঠিত করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছি। ক্যারিয়ার গঠনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন জরুরি, তেমনি নিজের মধ্যে কিছু গুণ ও দক্ষতার সন্নিবেশ ঘটানোও জরুরি। এগুলো আমরা পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জন করতে পারি। এ অধ্যায়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মসচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, সততা, পেশাগত নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভৃতি বিষয়ে জানব। তাছাড়া নেতৃত্ব, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, সহমর্মিতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও চাপ মোকাবিলা, সময় ব্যবস্থাপনা, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ক্যারিয়ার গঠনের প্রয়োজনীয় গুণ ও দক্ষতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

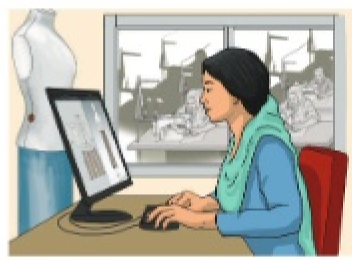

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

১. ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও দক্ষতা চিহ্নিত করতে পারব;

২. ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও দক্ষতা অর্জনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;

৩. ক্যারিয়ারের সফলতায় গুণাবলি ও দক্ষতাগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব এবং

৪. ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী হব।

ক্যারিয়ার গঠনে গুণ ও দক্ষতা

ভবিষ্যতে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রথমেই নিজ নিজ ক্যারিয়ার গঠনে যত্নবান হতে হবে। ভালোভাবে ক্যারিয়ার গঠন করতে হলে বিশেষ কিছু গুণ ও দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। ক্যারিয়ার গঠনে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু গুণ ও দক্ষতা নিচে আলোচনা করা হলো:

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

মানবজীবনে সাফল্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিশেষ অথচ অদৃশ্য উপাদান। জন্মের পর থেকে শুরু করে বেড়ে ওঠার সময়ে মানুষের মধ্যে অজান্তেই আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হতে থাকে। পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা, পারিবারিক শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। মানুষ যেকোনো বিষয় বা কাজের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তা নির্ভর করবে সে কেমন শিক্ষা পাচ্ছে, কেমন পরিবেশ বা সমাজে বেড়ে উঠছে এবং কোন সংস্কৃতিকে লালন করছে তার উপর। এজন্য একই বিষয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে একেক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়।

দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হচ্ছে মনোভাব, মানসিকতা বা চিন্তার ধরন। অর্থাৎ একটি বিষয়কে কে কীভাবে দেখছে বা কীভাবে নিচ্ছে সেটিকে বলা যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি। দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানুষের মনোজাগতিক আদর্শ যার আলোকে সে যেকোনো বিষয়কে বিচার করে। কোনো বিষয়কে ভালোভাবে নেওয়া বা ঐ বিষয়ের প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করা কিংবা বিষয়টিকে ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে গ্রহণ করাই হচ্ছে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব

পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজের সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমাজের সকলের সঙ্গে আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই তার স্বকীয়তা বিদ্যমান থাকে। যে যত বেশি ব্যক্তিত্ববান সে তত বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

সমাজে যিনি যত জনপ্রিয় তিনি মানুষের কাছে ততটাই শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করা সহজ হয় এবং এ ধরনের মানুষকে সবাই পছন্দ করে। ফলে সমাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এতে সাফল্যের পথ সুগম হয়।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির গঠন

বিভিন্নভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে পারে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও শক্তিকে জাগ্রত ও প্রস্ফুটিত করে। শিক্ষার সংস্পর্শে এসে মানুষ তার মনন ও চিন্তন দক্ষতাকে শাণিত করতে পারে। এর মাধ্যমে তার চিন্তা করার ধরন ও মনোভাবের পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। ফলে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব তৈরি হয়।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকেও লালন করে। এভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবের সাথে সাথে প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যও পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের মানসপট গঠিত হয় তার পরিবার ও সমাজ থেকে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যগণ কোন বিষয়কে কীভাবে বিবেচনা করেন সেটি দেখে পরিবারের অন্য সদস্যরা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। অপরদিকে সমাজে বসবাস করার পাশাপাশি মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ থেকেও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক, ধর্মীয় অনুশীলন, বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিশীলিত হয়।

মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। নানা রকমের ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রভাব মানুষের মনোভাব পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাস্তব জীবনে কোন ঘটনা থেকে সে কী শিক্ষা পেল এবং তার কোন ধরনের অভিজ্ঞতা হলো এর ওপর ভিত্তি করে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। যেকোনো ঘটনার নেতিবাচক দিকের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে এ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়।

মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা মানুষকে জীবন চলার পথ নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে মানুষের স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ব পুনর্গঠিত হয়। প্রত্যেক সভ্যতা ও সমাজের নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ও সংস্কার আছে। এসব কৃষ্টি, সংস্কার ও রীতি-নীতি মানুষের মানসিকতাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ফলে তার মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা

ব্যক্তিগত জীবনে বা পেশাগত কারণে মানুষকে নানা ধরনের মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করা অনেক সহজ হয়। সম্পর্ক ভালো থাকলে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায় যা ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক।

ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক সময় কাউকে কাউকে বেশ চিন্তিত দেখা যায়, যা তার মানসিক অবস্থার উপর অনেক চাপ তৈরি করে। ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করলে মনের উপর থেকে অনেক চাপ কমে যায়। ফলে মনোযোগ ও দক্ষতার সাথে যেকোনো কাজ সম্পাদন করা যায়।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে কাজে উৎসাহ ও মনোযোগ বাড়ে। যারা এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে তারা কোনো কাজকে হীন মনে করে না এবং কাজ করার প্রতি তাদের কোনো অবহেলা থাকে না। ফলে তারা ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে পারে।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে যেকোনো সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। অনেকে আছে যারা নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সমস্যা সমাধানের পথে না গিয়ে সেটিকে আরো জটিল করে তোলে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা সমস্যা সমাধান করতে চায় তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সমস্যাটির সমাধান এবং সহজেই তারা তা করতে পারে।

আত্মসচেতনতা

আত্মসচেতনতা বলতে বোঝায় নিজের ব্যাপারে সচেতনতা। অর্থাৎ নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা। কোন কাজে মঙ্গল আর কোন কাজে অমঙ্গল সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা। আমি কী কাজ করছি, কেন করছি, কোন উপায়ে করছি, কাজের ফলাফল কী, কাজটির কোনো নেতিবাচক দিক আছে কি না, কাজটির ফলে নিজের বা অন্যের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না? এসব বিষয়ে নিজের উপলব্ধিকে আত্মসচেতনতা বলে।

আত্মসচেতন হওয়ার গুরুত্ব

আত্মসচেতন মানুষ জীবনে কখনো বড় ধরনের বিপদে পড়ে না। কারণ তারা নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবহিত থাকে। সমাজের অন্যদের চেয়ে এ ধরনের মানুষ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে। আত্মসচেতন থাকার গুরুত্ব অনেক। আত্মসচেতন মানুষ পূর্বেই যেকোনো অমঙ্গল, বিপদ, ক্ষতি বা অনভিপ্রেত অবস্থা সম্পর্কে জানতে বা অনুমান করতে পারে। ফলে তারা পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পায়। তারা বিপদে পড়লে দ্রুত সামলে নিতে পারে।

আত্মসচেতন হওয়ার উপায়

আত্মসচেতন হওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে পারিপার্শ্বিক সকল বিষয়ে ধারণা রাখা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। শিক্ষা মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়, ফলে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী সচেতন হয়ে যেকোনো কাজ সাফল্যের সাথে করতে পারে।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে সচেতন হওয়া সম্ভব। নিজের অভিজ্ঞতা, পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সদস্যের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়।

আত্মসচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিষয়াবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান ঘটনাপ্রবাহে নজর রাখা এবং বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আত্মসচেতনতাবোধ তৈরি হয়। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা আত্মসচেতন হওয়ার আরেকটি দিক। যে ব্যক্তি তার পরিবেশ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানে এবং সচেতন থাকে সে নিজের সম্পর্কেও সচেতন থাকে।

ক্যারিয়ার গঠনে আত্মসচেতনতার ভূমিকা

সচেতন থাকলে জীবনের যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। আত্মসচেতন মানুষ নিজেদের ভালো-মন্দ নিজেরা অনুধাবন করতে পারে বিধায় ক্যারিয়ারের কোন সময়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে সেটি ভালো হবে তা তারা বুঝতে পারে।

অনেক সময় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে। গৃহীত সিদ্ধান্তটি সঠিক নাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সচেতন ব্যক্তিরা সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করে দ্রুত অন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা তাদের ক্যারিয়ারকে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

একজন মানুষ কতটুকু সফল তা বোঝা যায় তার অর্জন থেকে। আত্মসচেতন মানুষেরা তাদের নিজেদের অর্জন নিজেরাই মুল্যায়ন করে থাকে। ফলে তাদের পক্ষে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়ে যায়।

অন্যের উপর নির্ভরশীল হলে ক্যারিয়ারে সফল হওয়া যায় না। তাছাড়া অন্যের প্রতি নির্ভরশীলতা মানুষকে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং তারা স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। আত্মসচেতনতা অন্যের প্রতি নির্ভরশীল না হওয়ার শিক্ষা দেয়। আত্মসচেতন ব্যক্তিরা কখনো অন্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে না।

আত্মবিশ্বাস

আত্মবিশ্বাস অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়। অর্থাৎ নিজের শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসই আত্মবিশ্বাস। যেকোনো কাজ আমি যথাযথভাবে করতে পারব এবং সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হব এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে লালন ও ধারণ করাকে আত্মবিশ্বাস বলে।

২০২৫

আত্মবিশ্বাসী হওয়ার গুরুত্ব

আত্মবিশ্বাস যেকোনো ব্যক্তিকে সবসময় দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আত্মবিশ্বাসীরা নিজেদের শক্তিমত্তা ও সক্ষমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী হয় বলে তারা দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে পারে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ সকলের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। অন্যরা যখন দেখে কেউ খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে কোনো কাজ সম্পাদন করছে তখন তারা ঐ ব্যক্তির প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করে। আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করলে কাজটি নিখুঁত, নির্ভুল ও কার্যকরী হয়। আত্মবিশ্বাসীরা অন্যদের সমালোচনাকে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তার উপর অটল থাকে এবং তা বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে অন্যরা তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকার কারণে যেকোনো কাজে আত্মবিশ্বাসীরা সহজেই সফলতা অর্জন করে।

আত্মবিশ্বাস অর্জনের উপায়

শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে, পরিশীলিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ আত্মোপলব্ধির সুযোগ পায়। শিক্ষা মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে ও জানতে সহায়তা করে। ফলে তারা আত্মবিশ্বাসী হওয়ার রসদ পায়।

আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে হবে। মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে যে সে কোন বিষয়ে দক্ষ ও কোন বিষয়ে নয়। যা সে ভালো বুঝে ও ভালো পারে তাই তার শক্তি ও সামর্থ্য। অর্থাৎ আমি কী করতে পারি বা কোন বিষয়ে আমার দক্ষতা বেশি সে বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে। যে বিষয়ে আগ্রহ বেশি সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বা বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

কোনো কাজ করতে গিয়ে ভুল হলে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো যায়। কী কী কারণে ভুল হলো তা চিহ্নিত করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে কাজ করলে আর ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হলে কোনো বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা যাবে না। এ কাজটি কঠিন বা এটা আমাকে দিয়ে হবে না এ রকম মনোভাব পোষণ করলে মনে সাহসের ঘাটতি দেখা দেয়, যার ফলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচনা করলে কোনো কাজই কঠিন মনে হবে না এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

ক্যারিয়ার গঠনে আত্মবিশ্বাসের ভূমিকা

যাদের আত্মবিশ্বাস বেশি তারা লক্ষ্য নির্ধারণে সব সময় অগ্রগামী থাকে। তারা ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে দৃঢ় মনোবলের সাথে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে এবং লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকে। কোনো ধরনের হীনম্মন্যতা ও অন্যের নেতিবাচক মন্তব্য তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জন থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অনেকে অল্প সময়ে লক্ষ্য অর্জনের স্বপ্ন দেখে থাকে। কোনো কারণে লক্ষ্য পূরণে দেরি হলে তারা থমকে যায়, হতাশ হয়ে যায়। কিন্তু যারা আত্মবিশ্বাসী তারা দমবার পাত্র নয়। তারা জানে, একদিন না একদিন সফলতা আসবেই, তাই তারা সর্বদা লক্ষ্যমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। আত্মবিশ্বাসীরা সব সময় সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা দৃপ্ত সাহসে বলীয়ান হয়ে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিরা কখনো তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতা ঐ কাজের সফলতার পথে প্রধান অন্তরায়। আমি এ কাজ পারব কিনা বা আমার দ্বারা হবে না কিংবা এ কাজ করলে কে কী বলবে এ ধরনের ভাবনাকে হীনম্মন্যতা বলে। আত্মবিশ্বাসীরা হীনম্মন্যতা সহজে জয় করতে পারে।

২০১৫

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্যারিয়ার গঠনের অন্যতম উপাদান। অনেকে আছে যারা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভীত হয়ে পড়ে বা বিভিন্ন পিছুটান তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। আত্মবিশ্বাসীরা সহজেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কারণ তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তাই বাস্তবায়ন করে থাকে।

অ্যাসাইনমেন্ট : তোমার আশপাশের এমন একজনকে খুঁজে বের কর যাকে তোমার খুব আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হয়। তার আচরণ, কাজ পর্যবেক্ষণ করো। তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো। প্রয়োজনে প্রশ্নমালা তৈরি করে তার সাক্ষাৎকার নাও। এবার লেখো–

- তার লক্ষ্য কী ছিল
- কীভাবে তিনি তার লক্ষ্যে পৌছান
- তিনি কী কী বাধার সম্মুখীন হয়েছেন
- কীভাবে তিনি সব বাধা বা প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছেন

এবার তার মধ্যে তুমি আত্মবিশ্বাসের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেছ তার একটি তালিকা তৈরি করো। শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে শ্রেণিতে সবার সামনে তা উপস্থাপন করো।

দৃঢ় প্রত্যয়

জীবনে লক্ষ্য অর্জনে চাই ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন কিংবা স্বপ্নপূরণ হয় না। এ কঠিন প্রতিজ্ঞার অপর নাম দৃঢ় প্রত্যয়। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে লক্ষ্য অর্জন ও স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। ব্যাপক আগ্রহ ও সুদৃঢ় মনোবলসহ কোনো কাজ করাই দৃঢ় প্রত্যয়। দৃঢ় প্রত্যয়ীরা কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে কাজের বাস্তবায়নে অটুট থাকে।

দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব

প্রত্যেক মানুষের জীবনে দৃঢ় প্রত্যয়ের গুরুত্ব অনেক। দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে নিজের ক্যারিয়ারকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো কাজ শুরু করলে লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা থাকে। কারণ দৃঢ় প্রত্যয়ীরা কখনো তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে পিছু হটে না বরং তারা যেকোনো উপায়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌছে। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো কাজ শুরু করলে তা সময়মতো সম্পন্ন হয়। লক্ষ্য অভিমুখে আপ্রাণ প্রচেষ্টা থাকার ফলে কাজগুলো একটির পর একটি সম্পূর্ণ হতে থাকে।

দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার উপায়

দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার জন্য সবার আগে প্রয়োজন স্বপ্ন বা নির্দিষ্ট লক্ষ্য। কারণ কোনো লক্ষ্য বা স্বপ্ন না থাকলে লক্ষ্যমুখী কোনো তৎপরতা থাকে না। এ ধরনের উদ্যোগ ছাড়া দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার সুযোগ থাকে না। তবে স্বপ্ন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে। বাস্তবের সাথে মিল নেই, জীবনের জন্য আবশ্যকীয় নয় বা বাস্তবে তা অর্জন সুদূর পরাহত এমন বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী হলে লক্ষ্যকেন্দ্রিক সকল তৎপরতা হবে পণ্ডশ্রম। কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের জন্য যে যে দক্ষতা আবশ্যক তা থাকতে হবে। লক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকলে কাজের শুরুতেই হোঁচট খেতে হবে। কেউ যদি লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করে তবে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হলে নিজের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। কোনো লক্ষ্য স্থির করলে তা সম্পর্কে পূর্বাপর ভেবে নেওয়া জরুরি। লক্ষ্যের ভালোমন্দ সম্পর্কে জানা ও সচেতন থাকা উচিত। লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও সচেতনতা মানুষকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে।

ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভূমিকা

ব্যক্তিগত জীবনে যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী তারা সব সময় তাদের স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি অবস্থান করে। ক্যারিয়ারমুখী তৎপরতার কারণে তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হয়। এতে ক্যারিয়ারে সফলতা লাভ করা যায়। যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী তারা তাদের ক্যারিয়ারে কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। তাদের জীবনে একটার পর একটা সাফল্য আসতে থাকে এবং এক সময় তারা সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করে। যেমন– দৃঢ় প্রত্যয় থাকার কারণে আমাদের এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজরীন এভারেস্ট জয় করেন।

শ্রদ্ধা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক

শ্রদ্ধা একটি সামাজিক মূল্যবোধ। সমাজের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও কাঙ্ক্ষিত একটি বিশেষ চারিত্রিক গুণ হচ্ছে শ্রদ্ধাবোধ। কাউকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়া কিংবা মানুষের জ্ঞান, অবস্থান, মর্যাদা ও সক্ষমতাকে সমীহ করাকে শ্রদ্ধা বলে। অন্যকে এভাবে মূল্যায়ন বা সমীহ করার যে মানসিকতা, মনোভাব ও বোধ তাকে শ্রদ্ধাবোধ বলে। যারা সমাজের অন্যদের সম্মান করে না, তাদের কাজকে স্বীকৃতি দিতে চায় না, সামাজিক অবস্থানকে হীন দৃষ্টিতে দেখে ফলে তারা নিজেরাও শ্রদ্ধা পায় না। নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাবোধও গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি নিজেকে শ্রদ্ধা করে না অন্যরাও তাকে শ্রদ্ধা করে না। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সমাজকে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দপূর্ণ করে তোলে।

মানুষ সমাজে একা বাস করতে পারে না। সমাজে সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে বলেই সমাজের উৎপত্তি হয়। এ কারণে সমাজের প্রতিটি সদস্য নানাভাবে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। কৃষক যেমন মৎস্যজীবীর ওপর নির্ভরশীল, তেমনি মৎস্যজীবী কৃষকের ওপর নির্ভরশীল। এমনিভাবে সমাজের প্রতিটি পেশার মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ পারস্পারিক নির্ভরশীলতা গড়ে উঠে। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কই আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক। বিশেষ কোনো প্রাপ্তির আশা না করে একে অন্যের সাথে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে যে সদ্ভাব বা সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বলে।

ক্যারিয়ার গঠনে শ্রদ্ধা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ভূমিকা

ক্যারিয়ার গঠনে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিশেষ সুফল রয়েছে। এটি লাভ করার উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কর্মক্ষেত্রেও যদি শ্রদ্ধাশীলতার গুণটি ধারণ করা যায় তবে নিজে যেমন উপকৃত হবে, তেমনি অন্যরাও উপকৃত হবে।

এমন অনেক কাজ আছে যা একার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিশেষত শ্রমবিভাজনের এই যুগে এটি আরও কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের কাজ সম্পাদন করার জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এর অর্থই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার গুণটি যদি কারো মধ্যে না থাকে তবে তার পক্ষে কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও এ গুণটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। সহপাঠী বন্ধুদের মাধ্যমে অনেক সময় নতুন বিষয় বা অজানা এমন বিষয় জানা সম্ভব হয়, যা ক্যারিয়ারে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

মানুষের জীবনে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। যাদের এ ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তারা বিপদে পড়ে কম; আর বিপদে পড়লেও দ্রুত পরিত্রাণ পায়। এদের বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় অন্যরা এগিয়ে আসে ও সহযোগিতা করে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা রাখে। ক্যারিয়ারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ভালো রাখার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সহপাঠী, বন্ধু, শিক্ষক ও অন্যদের সাথে সম্পর্ক ভালো থাকলে সহযোগিতা পাওয়া যায় ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

দলগত কাজ

শ্রেণির সবাই তিনটি দলে ভাগ হয়ে যাও। শিক্ষক তিনটি কাগজের একটিতে শ্রদ্ধা, একটিতে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও অপরটিকে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক লিখে কাগজগুলো ভাঁজ করে তিন দলের তিনজনকে লটারির মাধ্যমে বেছে নিতে বলবেন। এবার প্রতিটি দল তাদের পাওয়া কাগজ খুঁজে (শ্রদ্ধা, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের মধ্যে) যেটি পেয়েছে তা নিয়ে নিম্নোক্ত কাজ করবে।

* ধারণাটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
* এবার ধারণাটি প্রকাশ পায় এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করো।
* কোন কোন আচরণের মাধ্যমে এই ধারণা প্রকাশ পায় তার একটি তালিকা তৈরি করো।
* এবার শ্রেণির সবার সাথে আলোচনা করো।

সততা, পেশাগত নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা

সততা একটি মৌলিক মানবীয় গুণ। সততা হচ্ছে সত্য বলা, সত্যকে ধারণ করা, সত্যকে লালন করা এবং সত্যকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ জীবনের সবক্ষেত্রে চিন্তা-চেতনায়, কর্মে সত্যবাদী হওয়া এবং সৎ মনোবৃত্তির সাথে যেকোনো কাজ সম্পাদন করাকে সততা বলা হয়। যা দেখেছি, যা করেছি, যা ঘটেছে, যা পেয়েছি কোনো কিছু না লুকিয়ে তা হুবহু উপস্থাপন করাই সততা।

জীবন ধারণের জন্য মানুষকে কোনো না কোনো পেশার সাথে যুক্ত হতে হয়। প্রত্যেককে নিজ নিজ পেশায় কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন পেশাজীবীর কাছ থেকে যে কাঙ্ক্ষিত নিয়ম-নীতি ও আচরণ প্রত্যাশা করা হয় সংশ্লিষ্ট পেশায় তার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে পেশাগত নৈতিকতা। অর্থাৎ পেশায় সততা, দায়িত্বশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে চলার নামই হচ্ছে পেশাগত নৈতিকতা।

একটি সমাজ, রাষ্ট্র, ও শাসনব্যবস্থা আইনের শাসনের উপর নির্ভর করে। যে সমাজে আইন যথাযথভাবে মানা হয় সেখানে শৃঙ্খলা থাকে। আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা। আইন অনুযায়ী সব ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলা, আইনগত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া এবং আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ক্যারিয়ার গঠনে সততা, পেশাগত নৈতিকতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্ব ও ভূমিকা

মানবজীবনে সততার গুরুত্ব অপরিসীম। সততা মানুষকে উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতায় ভূষিত করে। সততাকে সকল ধর্মেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সততার মাধ্যমে মানুষ পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বস্ত হয়। কর্মক্ষেত্রে সৎ থাকলে নিজেকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও সততা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাজীবন থেকে সততার গুণ অর্জন না করতে পারলে ক্যারিয়ারে বেশি দূর এগোনো সম্ভব হয় না। সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সততাকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

বর্তমান সমাজে পেশাগত নৈতিকতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মজীবনে যিনি যে পেশায় আছেন তিনি যদি তার কাজ, সেবা ও সময়ের প্রতি সৎ থাকেন তাহলে তিনি তার পেশায় নৈতিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকবেন। প্রত্যেক পেশাজীবী মানুষ যদি স্ব-স্ব পেশায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন তবে তাকে কখনো পেশাগত নৈতিকতার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। শিক্ষার্থী যদি নিজে সততা, দায়িত্বশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে তবে তার ক্যারিয়ার সুগঠিত হবে এবং পেশাগত জীবনে সে নীতিবান থাকতে সক্ষম হবে।

২০২৫

কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। সবাইকেই আইন মেনে চলতে হয় এবং আইনের আওতায় থাকতে হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সবার জন্যই আবশ্যক। তেমনি কর্মজীবনেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। শিক্ষাজীবন থেকেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে ক্যারিয়ার গঠনে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মনোভাব

নিজের সাথে নিজের প্রতিযোগিতাই ইতিবাচক প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় অন্যকে পরাজিত করার চেয়ে সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে নিজেকে আরো উন্নত প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায় তাই ইতিবাচক প্রতিযোগিতা। ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবার, প্রতিবেশী, সহপাঠী, বন্ধু তথা সমাজের বিশ্বাস, নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে বিবেচনায় রাখা হয়। যেমন– কেউ পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে চায়। এজন্য সে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, মনোযোগ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া করবে। শুধু নিজে ভালো ফল লাভ করলেই চলবে না, অন্য সহপাঠীরাও যাতে ভালো ফল অর্জন করতে পারে সেজন্য তাদের সহযোগিতা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সহযোগিতার ক্ষেত্রে সততা ও নৈতিকতা রক্ষা করতে হবে। ইতিবাচক প্রতিযোগিতার প্রতিফলন ঘটাতে হলে আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অন্য কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অন্যের সমস্যা বা বিপদে সহায়তা করার মানসিকতাই সহযোগিতার মনোভাব। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক রেখে প্রয়োজনে অন্যদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হয়। যেমন– পারিবারিক কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করা, সহপাঠীদের ক্লাসের পড়া বুঝতে সহায়তা করা, কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তার সেবা-যত্ন করা; প্রয়োজনে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কিংবা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে সহকর্মীদের সহযোগিতা করা। পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র কিংবা সমাজ সকল ক্ষেত্রেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন।

ক্যারিয়ার গঠনে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মনোভাবের ভূমিকা

ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত ও অন্যের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব পোষণকারীরা সহজেই সুন্দর ক্যারিয়ার গঠন করতে পারে। ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণকারী হলে সহজেই অন্যের আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করা যায়। অন্যরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মূল্যায়ন করে। সে নিজে কখনো বিপদ বা সমস্যাগ্রস্ত হলে অন্যরা তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ফলে সহজেই পরিবার, শিক্ষাক্ষেত্র, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আস্থা ও দক্ষতার সাথে কাজ করা যায় এবং সুনামের সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

দলগত কাজ

শ্রেণির সবাই দুটি দলে ভাগ হবে। এক দল ইতিবাচক প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত হওয়ার উপায় এবং অন্য দল সহযোগিতার মনোভাবসম্পন্ন হওয়ার উপায়সমূহ আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত চার্টে উপস্থাপন করো।

নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহ

অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেককে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। যেকোনো দলগত কাজ বা বহুসংখ্যক লোকের একত্রে কাজ করার সময় সকলের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ পরিচালনার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে যেকোনো একজনকে ঐ দলের সমন্বয় ও পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের এই

দায়িত্ব কোনো একজনের উপর ন্যস্ত করার প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব বলে। সহজ ভাষায় বললে নেতৃত্ব হচ্ছে কাজ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ করা ও কর্মীদের অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়া।

নেতৃত্বের ধরন :

গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব: এ ধরনের নেতা সব কাজে তার কর্মী বাহিনীর মতামত নিয়ে থাকেন। কর্মীরা স্বাধীনভাবে ও চাপমুক্ত থেকে যেকোনো মতামত দিতে পারে। কর্মীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে তিনি সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন।

ক্যারিশমেটিক নেতৃত্ব : এ ধরনের নেতার সবাইকে আকর্ষণ করার অপরিসীম ক্ষমতা থাকে। সাধারণত প্রবল আকর্ষণ শক্তির অধিকারী এধরনের নেতার নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অন্যরা সহজে মেনে নেয়। কারণ অনুগামীরা নেতার সাথে একাত্মতা অনুভব করে থাকে।

স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব: এ ধরনের নেতা কোনো কাজেই তার কর্মী বাহিনীর মতামতকে গুরুত্ব দেন না। তিনি তার নিজস্ব চিন্তা ও পছন্দের ওপর ভিত্তি করে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ও বাস্তবায়ন করেন।

পরিস্থিতিভিত্তিক নেতৃত্ব: এ ধরনের নেতা সমসাময়িক অবস্থা ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি কখনো গণতান্ত্রিক আবার কখনো স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করেন।

নির্জীব নেতৃত্ব: এ ধরনের নেতা সক্রিয় ও সচেতন নন। তারা কর্মী বাহিনীর সব কথা মেনে নেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেন। এরা নামেমাত্র নেতা; কর্মীরা তাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না এবং কর্মীদের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

নেতৃত্বের উপাদান: নেতৃত্ব গড়ে উঠার জন্য তিনটি উপাদান আবশ্যক। এগুলো হলো নেতা, অনুগামীবৃন্দ ও পরিস্থিতি। এই তিনটি উপাদানের সম্মিলনে নেতৃত্ব জেগে উঠে।

নেতৃত্বের গুণাবলি

নিচে নেতৃত্বের কয়েকটি গুণ উল্লেখ করা হলো। তোমরা দলে আলোচনা করে তোমাদের মতে আর কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করো।

♦ যথাযথ জ্ঞান	♦ যোগ্যতা	♦ ঝুঁকিগ্রহণের মানসিকতা
♦ আবেগ নিয়ন্ত্রণ	♦ ব্যক্তিত্ব ও সক্রিয়তা	♦ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা
♦ অধ্যবসায়	♦ সময়ানুবর্তিতা	♦ ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যের নেতৃত্বে কাজ করার মানসিকতা

উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহ

কোনো কাজ ও কাজের প্রতি আগ্রহ নিজ থেকে শুরু হয়ে যায় না। কাজের চিন্তাটি প্রথমে কোনো একজনের মাথা থেকে আসে, তারপর তিনি যখন কাজটি করার আয়োজন করেন তখনই কাজ শুরু হয়। এই প্রক্রিয়াকে এককথায় বলে উদ্যোগ গ্রহণ। উদ্যোগ হচ্ছে কোনো কাজের প্রথম পদক্ষেপ। স্বাধীনভাবে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যের নির্দেশনা ব্যতিরেকে তা শুরু করে দেয়ার যোগ্যতাকে উদ্যোগ বলে। অপরদিকে কাজ করার মানসিকতাকে কাজের প্রতি আগ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ খুশিমনে আনন্দের সাথে নিজে থেকে কোনো কাজ করার ইচ্ছা বা মানসিকতাকে কাজের প্রতি আগ্রহ বলা হয়। যেমন– একজন নিজ উদ্যোগে কাজ শুরু করায় অনেকে এ কাজে এগিয়ে আসে।

২০২১

ক্যারিয়ার গঠনে নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহের ভূমিকা

পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, উদ্যোগ গ্রহণের যোগ্যতা ও কাজের প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। যার এসব যোগ্যতা আছে তাকে দিয়েই সবাই কাজ করাতে চায়। কর্মক্ষেত্রে যাদের নেতৃত্ব, উদ্যোগ গ্রহণের যোগ্যতা ও কাজের প্রতি আগ্রহ আছে তারা সহজেই অন্যদের সমীহ আদায় করতে সক্ষম হয়। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা দেখতে চান কর্মীর মধ্যে নেতৃত্ব, উদ্যোগ ও কাজের প্রতি আগ্রহ আছে কি না। শিক্ষানবিশ কর্মীরা এ দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারলে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পায়। তাই শিক্ষাজীবন থেকেই এসব দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয়।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা

মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতার অগ্রভাগে আছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যহীন দেহ ও মন নিয়ে কখনোই স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। মানুষের শরীর ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বিধিবিধান সম্পর্কে জানা ও সে অনুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা।

জন্মের পর থেকেই মানুষের দৈহিক বিকাশ বা শারীরিক উন্নতি ঘটতে থাকে। এ সময় সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে শারীরিক বিকাশ ভালো হয়। প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি স্বাস্থ্য বিধি জেনে সে অনুযায়ী নিজের স্বাস্থ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করে থাকে। অপর দিকে দেহের সাথে মনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়। মানুষের দৈহিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশও সাধিত হয়। কোনো কারণে মন খারাপ হলে মানুষের কর্মক্ষমতা ও সক্ষমতা হ্রাস পায়।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের কাজ করতে হয়। নিচে এ ধরনের কিছু কাজের তালিকা প্রদান করা হলো।

শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলি	মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলি
সুষম খাদ্যাভ্যাস	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	হাসিখুশি থাকা
প্রয়োজনীয় ব্যায়াম	পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম নেওয়া
নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস	যথাযথ বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
সময়মতো ঘুমানো এবং জেগে ওঠা	পড়ার অভ্যাস তৈরি করা
স্বাস্থ্যবিধি জানা ও মেনে চলা	বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক তৈরি
প্রয়োজনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা	আবেগ বুঝতে পারা ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া
স্বাস্থ্যকর পোশাক ও আবাস	মানসিক চাপমুক্ত থাকা
স্বাস্থ্যহানিকর দ্রব্য এড়িয়ে চলা	প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানো, বাগান করা, পশুপাখির যত্ন নেওয়া ইত্যাদি

ক্যারিয়ার গঠনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার ভূমিকা

কথায় আছে সুস্থ দেহে সুস্থ মন। শরীর কিংবা মন যদি সুস্থ না থাকে তবে মানুষ কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। তাই যেকোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন নিজেকে সুস্থ রাখা। পারিবারিক কাজ, লেখাপড়া কিংবা কর্মক্ষেত্রের কাজ সবক্ষেত্রেই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। লেখাপড়ার সময়ে যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা যায় তবে পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায় এবং পরীক্ষায় ভালো করা যায়। ক্যারিয়ার গঠনে এ বিষয়টির

ভূমিকা আরো বেশি। ক্যারিয়ারের জন্য প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এ সময় শরীর ও মন ভালো না থাকলে যেকোনো পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। তাই শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যকর ও সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য।

কাজ ১ : তোমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি করে এমন ক্ষতিকর অভ্যাসসমূহ চিহ্নিত করো ও তার একটি তালিকা তৈরি করো। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো। (মাদকদ্রব্য গ্রহণ, একাকিত্বে ভোগা ও বিষণ্ন থাকা)

কাজ ২ : 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

সহমর্মিতা

মানুষকে প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে কিংবা কর্মক্ষেত্রে নানা রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো তার বিপদ আসে, কখনো তার মধ্যে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় তখন মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্তবোধ করে, বিষণ্ন থাকে কিংবা নানা দুঃখ-কষ্টে ভোগে। এমন অবস্থায় এ ধরনের মানুষের সাথে মানসিকভাবে একাত্ম হওয়াকে সহমর্মিতা বলে।

দুঃখী, বিপদগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত কিংবা বিপন্ন-বিষণ্ন মানুষের বেদনা, মনোকষ্ট উপলব্ধি করে তাদের সাথে একাত্ম ও সমব্যথী হওয়াই সহমর্মিতা। অন্যভাবে বলতে গেলে সহমর্মিতা বলতে মানুষের সকল যন্ত্রণা, কষ্ট, পীড়ন ও বিষণ্নতাকে নিজের অনুভূতিতে স্থান দিয়ে সে অনুযায়ী আচরণ করাকে বোঝায়। হৃদয়ের গভীরতম অংশ থেকে উৎসারিত অনুভূতিই সহমর্মিতা ।

সহমর্মিতার গুরুত্ব

মানুষের দুঃখ–কষ্টে সমব্যথী হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সহমর্মিতা পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পরিবারে বা সমাজের অন্য মানুষের বিপদে-আপদে সমব্যথী হলে এবং সহমর্মিতা প্রদর্শন করলে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন হয়। মানুষ একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং পরস্পর পরস্পরের যেকোনো ধরনের সমস্যায় এগিয়ে আসে। সমাজের সব সদস্য যদি একে অপরের সমস্যায় এগিয়ে আসে তাহলে তাদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। সমাজের সব সদস্য যখন একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার হবে এবং যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য

সহমর্মিতা ও সহযোগিতা আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও এ দুয়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। একটি অনুভূতি সম্বন্ধীয় আর অন্যটি বাস্তব সম্পর্কিত। নিচে ছকের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো।

নং	সহমর্মিতা	সহযোগিতা
১	ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম যা মনের ভাবনাকে প্রকাশ করে	অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে করা যায় না বরং দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো বৈষয়িক বস্তুর অস্তিত্ব থাকে
২	সমবেদনা প্রকাশ করা হয়, সমব্যথী হয়	দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে ভূমিকা রাখে
৩	আচরণিক সম্পর্ক জোরদার করে	ব্যবহারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়
৪	প্রতিদানের দরকার হয় না	প্রতিদানের সুযোগ আছে

ক্যারিয়ার গঠনে সহমর্মিতার প্রভাব

সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যমে অন্যের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। সহমর্মিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে একজন মানুষের ভেতরের মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়। সহমর্মী ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, অন্যদের কাছে সে বিশেষ মর্যাদা পায়। এসবের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তার বিকাশ ঘটে। কারো প্রতি একবার সহমর্মিতা প্রদর্শন করলে তার সাথে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়, সে সেটি মনে রাখে। পরবর্তী সময় কর্মজীবনে বা বাস্তব জীবনে কোনো সমস্যায় পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে পূর্ব-পরিচিতির সুবাদে তার সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পাওয়ার সুযোগ থাকে।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা

নারী ও পুরুষ মিলেই হচ্ছে মানব জাতি। সভ্যতার শুরু থেকেই নারী-পুরুষ যার যার অবস্থান থেকে সমাজব্যবস্থার বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে নারী-পুরুষের অবস্থান ও ভূমিকার পরিবর্তন হতে থাকে। নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও আচরণিক ভিন্নতা দেখা দেয়। নারী-পুরুষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির এই সম্পর্ককে জেন্ডার বলে।

জেন্ডার মানুষের জৈবিক পরিচয়কে নির্দেশ করে না, বরং নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের কাঙ্ক্ষিত আচরণ যা পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিকশিত হয়।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সমঅবস্থানে থেকে সমান কর্মদক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে এবং সমান সামাজিক মর্যাদা ও সমান আর্থিক সুবিধাদি ভোগ করবে। এই ধারণাকে সামনে রেখে যেকোনো কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়াকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলে।

জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়ার গুরুত্ব

জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়ার মাধ্যমে নারী কিংবা পুরুষের বা বিশেষ লিঙ্গের প্রতি সমাজে বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য কমে আসবে। নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই এ ধরনের বৈষম্যের বিলোপ ঘটবে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা যদি সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে নারী পুরুষের সামাজিক ও ব্যক্তিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ তাদের মধ্যে এ ধারণা তৈরি করবে যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি জেন্ডার সংবেদনশীল হয় তাহলে সমাজে নারী-পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সমাজের কেউ কাউকে তখন হীন করার চেষ্টা করবে না এবং বিশেষ কোনো লিঙ্গের মানুষের প্রতি মানুষের বিরাগ থাকবে না। জেন্ডার সংবেদনশীলতা মানুষের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটায়। প্রত্যেকের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে। এর ফলে মানুষের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমানভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। পরিবারের ক্ষেত্রেও জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন, এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি হবে। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে যা পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়ার উপায়

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের উচিত আগে নিজের অবস্থান, মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হওয়া। অন্যের অবস্থান, মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে বিবেচনা করলে সমলিঙ্গ বা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধাজনক মনোভাব তৈরি হবে না। নারী-পুরুষ প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি যদি কোনো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তা পরিবর্তন করতে হবে। পরস্পরের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বা ধারণা পোষণ করে জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া সম্ভব নয়। পরিবারই হচ্ছে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর পরিবার থেকেই শুরু হয় প্রথম জেন্ডার বৈষম্য। তাই পরিবারকে সবার আগে জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে। যদি পরিবার জেন্ডার সংবেদনশীল হয় তাহলে পরিবারের সদস্যরা জেন্ডার সংবেদনশীল হয়ে গড়ে উঠবে।

ক্যারিয়ার গঠনে জেন্ডার সংবেদনশীলতার ভূমিকা

জেন্ডার সংবেদনশীলতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্রেই এর প্রভাব বেশি। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করবে, সমান সুবিধা ভোগ করবে, এটা নিয়ম হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে হলে কর্মী নিয়োগ, কর্মবণ্টন, প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত পরিবেশ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, সুবিধাদি ও মর্যাদা এবং কর্মী মূল্যায়নে বিশেষ লিঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়ে মেধা, শ্রম ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ কিংবা কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় থাকলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্প্রীতি, আস্থা বৃদ্ধি পায়। এতে কর্ম পরিবেশ সুন্দর হয়। তখন সবাই নিজ নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

বিশ্লেষণ করা ও সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা

কোনো ঘটনা ঘটলে অনুসন্ধিৎসু মানুষ সে ঘটনার কারণ খোঁজার চেষ্টা করে। বিভিন্ন আঙ্গিকে ঘটনা ব্যাখ্যা করে সে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই কারণ খোঁজার চেষ্টাই হচ্ছে মানুষের বিশ্লেষণ ক্ষমতা। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো ঘটনা সম্পর্কে তদন্তে গেলে তারাও এই ধরনের বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্লেষণ করার দক্ষতা মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা হচ্ছে বিশ্লেষণী ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মবিশ্বাসের সমন্বয়। এটা কখনো পূর্বনির্দেশিত নয় এবং নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকে করা সম্ভব হয় না। নতুন করে কিংবা ভিন্নভাবে কোনো কিছু চিন্তা করার দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। সৃজনশীল চিন্তন বিষয়ে 'Think out of the box' বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ প্রথাগত কাঠামোর বাইরে চিন্তা করার দক্ষতাই হচ্ছে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা।

বিশ্লেষণ করার ধাপ

কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে ওই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এরপর বিষয় বা ঘটনার বিবরণ জানতে হবে। ঘটনার বিবরণ জানার পর ঘটনা বা বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে হবে পরবর্তী ধাপে বিষয় বা ঘটনাটি বিভিন্ন আঙ্গিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ করার ধাপ
১. তথ্য সংগ্রহ করা ↓ ২. ঘটনার বিবরণ জানা ↓ ৩. ঘটনার গভীরে প্রবেশ করা ↓ ৪. বিভিন্ন আঙ্গিক ও দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা ↓ ৫. সিদ্ধান্ত নেওয়া

সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়

সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতি নেই। প্রথাগত কাঠামোর বাইরে স্বাধীন ও মুক্তভাবে চিন্তার অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা, কোনো তত্ত্বকে কাগজে এঁকে, দৈনন্দিন কাজের রুটিনে পরিবর্তন এনে, কোনো সমস্যার সমাধান চিন্তা করে এবং নতুন কিছু চিন্তা করার মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

ক্যারিয়ার গঠনে বিশ্লেষণ ও সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার ভূমিকা

ক্যারিয়ার গঠনে বিশ্লেষণ ও সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষাজীবনে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন নানা বিষয় সামনে চলে আসে। এ সময় প্রত্যেকেই নিজস্ব বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ও সিদ্ধান্ত নেয়। যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা যদি কারো থাকে তাহলে সে সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চায় শিক্ষার্থী বা অধীনস্থ কর্মী তার নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে কাজটি করুক। যারা সৃজনশীল চিন্তা করতে পারে তাদের কাছে বিষয়টি খুবই সহজ এবং তারা অনায়াসে তা করতে পারে। এজন্য যারা যত বেশি বিশ্লেষণী ও সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী ক্যারিয়ার গঠনে তারা তত বেশি এগিয়ে থাকে।

> **কাজ:** প্রত্যেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে একটি করে ঘটনা চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত বিশ্লেষণ করার ধাপ অনুযায়ী ঘটনাটি বিশ্লেষণ করো।

সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা

চলার পথে মানুষকে নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কখনো ব্যক্তিগত সমস্যা আবার কখনো পারিবারিক সমস্যা। আছে সামাজিক সমস্যা আবার কখনো কর্মক্ষেত্রে সমস্যা। কিন্তু তাই বলে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কিংবা সমস্যাকে দমিয়ে রেখে মানুষ কাজ করে না। প্রত্যেক সমস্যারই কোনো না কোনো সমাধান আছে। গ্রহণযোগ্য একটি উপায়ে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রক্রিয়াকে সমস্যা সমাধান বলে।

যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলত প্রত্যেকটি কাজ শুরুই হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কেউ যদি কোনো কাজ করব কি করব না, ভালো হবে কি হবে না এই নিয়ে

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে তাহলে ব্যক্তির সেই অবস্থাকে বলা হয় সিদ্ধান্তহীনতা । এ অবস্থা কাটিয়ে ভালো-মন্দ বিবেচনায় রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় । কোনো কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারার ক্ষমতাই হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা ।

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

শুরুতেই যে সমস্যাটি সামনে এসেছে সে সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে হবে । সমস্যাটিকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে ব্যাখ্যা করে করে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে হবে । এরপর সমস্যাটি কী কারণে হয়েছে এবং কোথা থেকে এই সমস্যার উৎপত্তি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে । সমস্যাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে । পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন । তথ্য সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণ করে সমস্যাটিকে একটি সমাধানযোগ্য প্রক্রিয়ায় আনতে হবে । যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পর সেটির উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য কয়েকটি সমাধান বের করতে হবে । সমাধানগুলোর মধ্য হতে কার্যকর এবং সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সমাধানটি গ্রহণ করতে হবে । সবশেষে গৃহীত সমাধানটি যথাযথভাবে কার্যকর কি না তা নিশ্চিত করতে হবে ।

সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া

১. সমস্যা বিশ্লেষণ
↓
২. কারণ ও উৎস অনুসন্ধান
↓
৩. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
↓
৪. সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণ
↓
৫. উপযুক্ত সমাধান নিরূপণ
↓
৬. সমাধানটি বাস্তবায়ন

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রথমেই তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন । সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ । পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কয়েকটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প সিদ্ধান্ত তৈরি করে নিতে হবে । বিকল্প সিদ্ধান্তগুলো অবশ্যই প্রথমে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে হতে হবে । বিকল্প সিদ্ধান্তসহ গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং এগুলোর ফলাফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বানুমান করে নিতে হবে । নিজের বিচার ক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে এটা করতে হবে । এ পর্যায়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং ফলাফল ইতিবাচক হয় এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে । এরপর গৃহীত সিদ্ধান্তটি যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে । সবশেষে গৃহীত সিদ্ধান্তটির ফলাফল মূল্যায়ন করতে হবে । যদি মনে হয় অন্য সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হতো তাহলে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে নতুন আরেকটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

১. কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা চিহ্নিতকরণ
↓
২. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
↓
৩. বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ
↓
৪. সম্ভাব্য ফলাফল নিরূপণ
↓
৫. গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ
↓
৬. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
↓
৭. সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা

ক্যারিয়ার গঠনে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার ভূমিকা

ক্যারিয়ার গঠনে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাজীবনে পছন্দের বিষয় ও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর ক্যারিয়ার গঠন নির্ভর করে। আবার শিক্ষাজীবন শেষ করার পর কর্মজীবনে প্রবেশের পুর্বে প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের কাজে সে নিয়োজিত হবে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ওপর তার ক্যারিয়ার গঠিত হয়। তাই সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যথাযথ ক্যারিয়ার গঠন করা যায়।

> **কাজ :** প্রত্যেকে বাস্তব জীবনে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সমস্যা চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমস্যাটির সমাধান করো।

চাপ মোকাবিলা

মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার ফলে মানসিক চাপ তৈরি হয়। দুঃখ-দুর্দশা, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত কাজের ভার, শোক, যন্ত্রণা, বিপর্যয় এগুলোর ভার একা এবং দীর্ঘ সময় বহন করতে হলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। মানসিক চাপ একটি মনোদৈহিক অবস্থা যা আমাদের শরীর ও মনের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে। কোনো কারণে দুশ্চিন্তা, মনোকষ্ট, উদ্বেগ দীর্ঘ সময় ধরে চললে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাঘাত ঘটায়। মানুষ বিচলিত হয় এবং এক পর্যায়ে ভেঙে পড়ে ও ভুল পথে পা বাড়ায়। তাই চাপকে প্রশ্রয় না দিয়ে চাপ মোকাবিলা করে সামনে এগোতে হবে। মানসিক চাপের কারণ অনুসন্ধান করে সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে চাপকে জয় করাই চাপ মোকাবিলা।

চাপ মোকাবিলার উপায়

সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য চাপ মোকাবিলা করা প্রয়োজন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে চাপ মোকাবিলা করার যোগ্যতা থাকা একান্ত গুরুত্বপুর্ণ। নিচে চাপ মোকাবিলা করার কয়েকটি উপায় দেখানো হলো। এ দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই চাপ মোকাবিলা করতে পারব।

১. মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী উপাদান/পরিস্থিতি/ব্যক্তি শনাক্ত করা;

২. শরীর ও মন কীভাবে এ সকল চাপ সৃষ্টিকারী উপাদানের প্রতি সাড়া দেয়, তা সনাক্ত করা;

৩. চাপ এর জন্য দায়ী উপাদান হ্রাস করা;

৪. নিজেকে শান্ত থাকতে বলা; বারবার বলা। নিজেকে বলতে হবে, কোনো অবস্থাই স্থায়ী নয়;

৫. মনোবল বজায় রাখা;

৬. বন্ধু বা নির্ভরযোগ্য কারো সাথে আলোচনা করা, পরামর্শ করা, শেয়ার করা। সহকর্মী কারো সাথে মনের কষ্টের কথা আলোচনা করলে চাপ লাঘব হয়;

৭. মনে রাখতে হবে, আনন্দ ভাগ করলে বেড়ে যায়, দুঃখ/কষ্ট/চাপ ভাগ করলে কমে যায়;

৮. গ্রহণযোগ্য পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা;

৯. সময় ব্যবস্থাপনা করা ।

চাপ মোকাবিলার গুরুত্ব

চাপ মোকাবিলার মাধ্যমে একজন মানুষ তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় । এর মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ সাধন হয় । আবেগপ্রবণ মানুষ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে । সে তখন কোনো যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হয় না । ফলে এ ধরনের মানুষ অনেক সময় নিজেদের ক্ষতি করে ফেলে । আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাপকে জয় করে এ ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । সাফল্য অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা আর চাপের কাছে নতি স্বীকার না করা । তোমরা যারা খেলাধুলা করো কিংবা খেলা দেখো, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ খেলোয়াড়রা নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কীভাবে খেলে যায় । ক্যারিয়ারে বিভিন্ন সময় ঘাত-প্রতিঘাত আসে । অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না কিংবা অনেক চাওয়া অপূর্ণ থেকে যায় । এসব কারণে অনেক সময় প্রচণ্ড মানসিক চাপ অনুভূত হয় । এ সময় যারা চাপ মোকাবিলা করে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তারা সফলকাম হয় ।

দলগত কাজ

বইয়ে উল্লিখিত উপায়গুলো ব্যতীত অন্য কী কী উপায়ে চাপ মোকাবিলা করা যায় তা দলে আলোচনা করে লিখে যুক্তিসহ উপস্থাপন করো ।

সময় ব্যবস্থাপনা

সব ধরনের কাজই কোনো না কোনো নিয়মের মাধ্যমে বা ব্যবস্থাপনার অধীনে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে । এক বা একাধিক ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক ও পরিকল্পিতভাবে যেকোনো কাজ সম্পাদন করে । এই পরিকল্পিত তৎপরতাকে ব্যবস্থাপনা বলে। আর সময়ের পরিকল্পিত ব্যবহার হচ্ছে সময় ব্যবস্থাপনা। পরিকল্পিত কাজগুলোকে সময় অনুযায়ী ভাগ করে এবং বাস্তবায়ন করে সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাকে সময় ব্যবস্থাপনা বলে ।

সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা সম্ভব হয় । কাজগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ে ভাগ করে নিলে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করলে সময়মতো কাজ সম্পন্ন হয় । পরিকল্পিত সময়ে পরিকল্পিত কাজ করার ফলে সময়ের অপচয় হয় না । সময় বিভাজন করে সে অনুযায়ী কাজ করলে দেখা যায় কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে । দ্রুত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বাড়তি সময়ে অন্য কাজ করার সুযোগ থাকে । ফলে দেখা যায় অল্প সময়ে অনেক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে । সময় ব্যবস্থাপনায় যেহেতু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রত্যেক কাজের জন্য সময় বরাদ্দ করা থাকে, তাই কাজের কোনো অংশকেই জটিল মনে হয় না । সময় ব্যবস্থাপনার আর একটি সুবিধা হলো এতে কোনো কাজ জমে থাকে না ।

সময় ব্যবস্থাপনার মডেল

বিখ্যাত লেখক পিটার ড্রাকার তার "The Effective Executive" গ্রন্থে সময় ব্যবস্থাপনা মডেলের তিনটি ধাপ উল্লেখ করেছেন–

সময় বিশ্লেষণ→ নিরর্থক চাহিদা চিহ্নিতকরণ→ কর্ম সম্পাদন

সময় বিশ্লেষণ : প্রত্যেককে তার নিজের কমপক্ষে এক সপ্তাহের সময়ের রেকর্ড রাখতে হবে এবং সময় বিশ্লেষণ করে কতটুকু সময় প্রকৃতপক্ষে কাজে লেগেছে আর কতটুকু সময় অপচয় হয়েছে তা আলাদা করতে হবে। এক্ষেত্রে সততার পরিচয় দিতে হবে। প্রয়োজনে কাছের কাউকে সাথে রাখা যেতে পারে।

নিরর্থক চাহিদা চিহ্নিতকরণ : সময় বিশ্লেষণের পর দেখা যাবে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ করা হয়, যার কোনো দরকার নেই এবং যা চাইলে বাদ দেওয়া যায়। এ ধরনের কাজগুলো চিহ্নিত করে রাখতে হবে এবং পরবর্তীকালে কাজের মধ্যে যাতে এগুলো ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

কর্ম সম্পাদন : সময়ানুযায়ী কাজের পরিকল্পনা এবং হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে কোনো কাজে বিরতি বা ব্যাঘাত ঘটে এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

মার্কিন গবেষক Stephen Covey তাঁর সময় ব্যবস্থাপনার চার স্তর বিশিষ্ট মডেলের কথা উল্লেখ করেছেন- যা 'Covey's Time Management Quadrant' নামে পরিচিত, নিচে মডেলটি দেখানো হলো।

	এখনই	**কাজ করার সময়** দেরিতে
বেশি ↑ গুরুত্ব	গুরুত্বপূর্ণ এবং এখনই করতে হবে। (করে ফেলো)	গুরুত্বপূর্ণ, তবে এখনই করতে হবে না। (ঠিক করো কখন করবে)
কম	গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে এখনই করতে হবে। (অন্য কাউকে হস্তান্তর করো)	গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এখনই করতে হবে না। (পরে করো)

ক্যারিয়ার গঠনে সময় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

সময় ব্যবস্থাপনা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনের গতিপথ পাল্টে যায়। সময়ের যথাযথ ব্যবহার তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশনা দেয়। সময়ের প্রতি যারা নিষ্ঠাবান তারা জীবনে অনেক দূর এগিয়ে যায়। ক্যারিয়ারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে লক্ষ্যে স্থির থাকা। সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়ের কাজ সময়ে করার অভ্যাসের কারণে একজন শিক্ষার্থী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার ক্যারিয়ারে কোন কাজের পূর্বে কোনটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারে। ফলে সফলতার হার বেড়ে যায়। সময় ব্যবস্থাপনা আমাদের অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার ফলে কাজের ক্ষেত্রে কখনো পিছিয়ে পড়তে হয় না। সময়ের সদ্ব্যবহারের কারণে কাজ করার পর্যায়ে কোনো ভুল হলে তা শোধরানোর সুযোগ থাকে। সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়ের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহজেই সফল ক্যারিয়ার গঠন করা যায়। মনে রাখতে হবে 'সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না'।

অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেকে Stephen Covey-এর সময় ব্যবস্থাপনার মডেল অনুসরণ করে আগামী এক সপ্তাহের নিজ নিজ কাজের তালিকা প্রস্তুত করো।

প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ নিজ হাতে সব কাজ করত। ধীরে ধীরে মানুষ চিন্তা করতে লাগল কীভাবে সহজে ও দ্রুত কাজ করা যায়। "প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী" এ প্রবাদকে সার্থক করে মানুষ ধীরে ধীরে এমন সব জিনিস এবং কাজের পদ্ধতি আবিষ্কার করতে লাগল যা তাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমকে অনেকটাই কমিয়ে দিলো। মানুষের কাজকে সহজ ও দ্রুত সম্পাদনের জন্য আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কর্মপদ্ধতিকে প্রযুক্তি বলা হয়। কবে, কোথায়, কখন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। মানুষ যখন তার কাজকে সহজ করার কোনো পদ্ধতি বা যন্ত্র আবিষ্কার করা শুরু করলো তখন থেকেই প্রযুক্তির জন্ম। আদিম যুগে পশু শিকারের জন্য বল্লম তৈরি করা কিংবা শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন আবিষ্কার করাকে প্রযুক্তির উদ্ভবের প্রাথমিক অবস্থা বলে স্বীকার করা হয়। তবে প্রযুক্তিবিদেরা মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের সময় থেকেই মূলত প্রযুক্তির উদ্ভব। এককথায়, প্রযুক্তি হলো কিছু প্রায়োগিক কৌশল, যা মানুষ তার পরিবেশ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব

অনেক কাজ আছে যা সাধারণভাবে করতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোনো কাজ খুব সহজেই করা যায়। যেমন আগে ধান মাড়াই করতে অনেক সময়ের দরকার হতো আর এখন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে অনেক ধান মাড়াই করা যায়। এতে মানুষের সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়। যেমন– পূর্বে পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় করা ছিল অনেক কঠিন কাজ আর এখন মুহূর্তেই কম্পিউটার দিয়ে ফলাফল তৈরি করা যায়। এখন প্রযুক্তির সহায়তায় প্রায় নির্ভুল কাজ করা সম্ভব। কম্পিউটারের সাহায্যে হাজার হাজার তথ্য থেকে গবেষণা করে নির্ভুল প্রতিবেদন তৈরি সম্ভব। প্রযুক্তির সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো কাজের ফলাফল জানা যায়। যেমন– বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এখন পরীক্ষার দিনই প্রকাশিত হচ্ছে। এটি প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি বড় দৃষ্টান্ত।

প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন

প্রযুক্তি কী, প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে করতে হয়, কোথায় কোথায় প্রযুক্তির ব্যবহার করা সম্ভব, কোন যন্ত্রের কী কাজ, যন্ত্রগুলো কীভাবে কাজ করে এসব বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে। বর্তমানে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে অনেকের মধ্যে ভীতি কাজ করে। প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এই ভয় কাটিয়ে উঠে আগ্রহ নিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু না করলে তা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন সম্ভব নয়। যে কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ মানুষকে দক্ষ করে তোলে। তাই দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির ব্যবহারে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির ব্যবহার

বর্তমানে ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তির ব্যবহার অন্যতম একটি দক্ষতা। দিন দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যতই ঘটছে সবকিছু ততই প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বেশির ভাগ কাজই এখন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফরম তোলা ও জমা দেয়া, টাকা জমা দেয়া, পরীক্ষার ফলাফল জানা ইত্যাদি কাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা থাকলে শিক্ষার্থীরা অন্যের সহযোগিতা ছাড়াই কাজগুলো সম্পাদন করতে পারবে। এছাড়াও

কর্মক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। চাকরির আবেদন করা, পরীক্ষা দেওয়া, বাস, ট্রেন, বিমানের টিকেট ক্রয় ইত্যাদি প্রযুক্তির সাহায্যেই হচ্ছে। তাই ক্যারিয়ার গঠনে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করার বিকল্প নেই।

গাণিতিক দক্ষতা

মানুষের জীবনের সাথে জড়িত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ অন্যতম। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি স্তরে, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে মানুষকে নানারকম হিসাব করতে হয়। সভ্যতার শুরু থেকেই হিসাব-নিকাশের এ ধারা চলে আসছে। মানুষের হিসাব-নিকাশের এ ধারাকে বইয়ের ভাষায় বলা হয় গাণিতিক দক্ষতা। গাণিতিক দক্ষতা বা গাণিতিক জ্ঞান হচ্ছে গণিতের সাধারণ ধারণাকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগানো। গাণিতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সহজেই তার প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক জীবনের হিসাব-নিকাশের প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে। গণনা করতে পারা, যোগ বিয়োগ, হিসাব রাখা, পরিমাণ ও পরিমাপ বোঝা, ভূমি বা জমির হিসাব বোঝা, পরিসংখ্যান বোঝা ইত্যাদি হচ্ছে গাণিতিক দক্ষতার উদাহরণ। গাণিতিক দক্ষতার তিনটি স্তর রয়েছে; যেমন–

১. সংখ্যা পরিচয় ও সাধারণ যোগ-বিয়োগ, সাধারণ হিসাব-নিকাশ (প্রাথমিক ধারণা)
২. প্রয়োজনীয় জীবনঘনিষ্ঠ গাণিতিক দক্ষতা
৩. উচ্চতর গাণিতিক দক্ষতা

গাণিতিক দক্ষতার গুরুত্ব

মানব জীবনে গাণিতিক দক্ষতার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। মানুষ নিজের অজান্তেই গাণিতিক দক্ষতার সাহায্যে সকল কাজ করে থাকে। যেমন– সংসারের বাজেট, ব্যবসায়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ করা। গাণিতিক দক্ষতা মানুষকে যৌক্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে; এর মাধ্যমে মানুষ সবকিছু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে শেখে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও গাণিতিক দক্ষতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন– একজন কৃষক জমিতে ফসল বোনা থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত যাবতীয় কাজের মূল্য নির্ধারণ করেন। তার বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি তিনি বুঝতে পারেন। ফলে পরবর্তী সময়ে তার পক্ষে চাষাবাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। এমনিভাবে মানুষের জীবনে গণিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

গাণিতিক দক্ষতা অর্জনের উপায়

গাণিতিক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন গণিতের প্রাথমিক বিষয়গুলো আয়ত্তে নেয়া। এরপর জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ গাণিতিক পন্থায় সম্পন্ন করলে গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন কঠিন ও জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ, নিজের ঘরের পরিমাপ, জমির মাপ-ঝোখ ইত্যাদি নিজেই করার চেষ্টা করতে হবে। গাণিতিক দক্ষতায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া গণিতের উপর বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে গাণিতিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যায়।

২০২৩

ক্যারিয়ার গঠনে গাণিতিক দক্ষতার ব্যবহার

একজন শিক্ষার্থী জীবনে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। এসব চড়াই-উতরাই পার হওয়ার জন্য নানান হিসাব-নিকাশ, যোগ-বিয়োগ করে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে হয়। এসব করার জন্য গাণিতিক দক্ষতা ব্যবহার করা হয়। ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে গাণিতিক দক্ষতার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কখনো কোনো একটি কাজ অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়; যারা গাণিতিকভাবে দক্ষ তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে কত গতিতে কাজ করলে যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার বা নিয়োগ পরীক্ষায় গাণিতিক দক্ষতা নিরূপণের জন্য প্রশ্ন করা হয়; এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে গাণিতিক দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। কর্মক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় পরিসংখ্যানভিত্তিক কিছু কাজ এসে পড়ে, যা গাণিতিক দক্ষতা ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য ক্যারিয়ারকে সুগঠিত করার জন্য গাণিতিক দক্ষতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলা নান্দনিক শব্দটি নন্দন থেকে এসেছে। নন্দন শব্দের অর্থ হলো যা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় বা যার দ্বারা আনন্দ লাভ করা যায়। যেহেতু আনন্দের উৎস হচ্ছে সৌন্দর্য তাই নন্দন শব্দের অর্থকে সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করা যায়। আর 'নান্দনিক' অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্যমণ্ডিত। যেকোনো কাজ সুন্দর করে গুছিয়ে করা যা দেখলেই সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয় তাকে নান্দনিকতা বলে। এই নান্দনিকতা যেমন হতে পারে শিল্পের ক্ষেত্রে তেমনি হতে পারে কবিতার ক্ষেত্রে। এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ কাজেও নান্দনিকতা বিদ্যমান।

কোনো কাজের ক্ষেত্রে কাজটিকে সুন্দর করে করার, সুন্দরভাবে কাজ করানোর বা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার যে বোধ, মনোভাব বা মানসিকতা তাকে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে।

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব

সবাই সুন্দরের পুজারি। কোনো কিছুর সৌন্দর্য বিচার করতে কিংবা সৌন্দর্য থেকে আনন্দ অনুভব করতে গেলে নান্দনিকতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে নান্দনিক। যার দৃষ্টিভঙ্গি নান্দনিক নয় তার পক্ষে সুন্দরকে সুন্দর হিসেবে বিচার করাই সম্ভব নয়। দৃষ্টিভঙ্গি নান্দনিক হলে মানসিক তৃপ্তি লাভ করা যায়, আনন্দের সাথে কাজ করা সম্ভব হয়।

ক্যারিয়ার গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা

সুন্দরভাবে কাজ করার গুরুত্ব অন্যরকম। কারণ সুন্দর কাজকে সবাই পছন্দ করে। কোনো পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার খাতায় যদি হাতের লেখা গোছানো হয় ও উপস্থাপনা সুন্দর হয় তবে শিক্ষক তাকে একটু আলাদা করে বিবেচনা করেন। ঐ শিক্ষার্থী শুধু সৌন্দর্যের কারণে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি নম্বর পায়। ক্যারিয়ার গঠনে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একজন শিক্ষার্থী যদি তার ওপর অর্পিত কাজগুলো গুছিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে তবে শিক্ষক, সহপাঠী ও অন্যরা তার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং তাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকে। একইভাবে কর্মক্ষেত্রেও সে যদি তার কাজে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে সক্ষম হয় তবে সে অন্যদের তুলনায় আলাদাভাবে বিবেচিত হয় এবং তার সম্মান ও মর্যাদা অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সবাই তার নৈকট্য লাভ করতে চায় ও তাকে ভালোবাসে।

দলগত কাজ

ছোট দলে ভাগ হয়ে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের উপায়সমূহ চিহ্নিত করো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আত্মসচেতনতা অর্থ কী?

ক. একাগ্রতা
খ. আত্মোপলব্ধি
গ. নিষ্ঠা
ঘ. বিশ্বাস

২. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ক্ষেত্রে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপুর্ণ?

ক. শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা
খ. ইতিহাস ও ঐতিহ্য
গ. সংস্কৃতি ও মুল্যবোধ
গ. পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা

৩. সময় ব্যবস্থাপনার অর্থ–

i. সময়কে নিয়ে একটি ছক তৈরি করা
ii. সময়কে ভাগ করে সেই অনুযায়ী কাজ করা
iii. এটি ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ ধরন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
গ. ii ও iii
খ. i. ও ii
ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পরাগ পড়াশোনায় ক্লাসে সবচেয়ে ভালো হলেও ক্লাস ক্যাপ্টেন হতে চায় না। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণ তাকে কিছু বলতে বললে সে অন্য কাউকে দিয়ে বলানোর জন্য অনুরোধ করে।

৪. কোনটির অভাবে পরাগ এমন আচরণ করে?

ক. নেতৃত্বের গুণাবলি
গ. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
খ. দৃঢ় প্রত্যয়
ঘ. সৃজনশীলতা

৫. উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি থাকলে পরাগ–

i. সহপাঠীদের কাছে অধিক গুরুত্ব পেত
ii. লক্ষ্য অর্জনে আরও সফল হতো
iii. সহপাঠীদের অনুপ্রাণিত করতে পারত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i.
গ. ii ও iii.
খ. i. ও ii.
ঘ. i, ii ও iii.

সৃজনশীল প্রশ্ন

নাসিমা একটি কলেজ থেকে বিএ পাস করে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। জীবনের প্রথম চাকরির সাক্ষাৎকার দিয়েই তার চাকরি হয়ে যায়। তার অনেক বন্ধু কয়েকটি পরীক্ষা দিয়েও সফল হতে পারে নি। তারা বলে যে, নাসিমার ভাগ্য অনেক ভালো তাই সে সহজেই চাকরি পেয়ে গেছে। নাসিমার প্রতিবন্ধী ভাই ইব্রাহিম হাঁটতে পারেন না; তার হাত দুটোও প্রায় অকেজো। কারো কাছে হাত পেতে সাহায্য নেওয়াকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। নিজের চেষ্টার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। ছোট্ট একটি মুদি দোকান দিয়ে ইব্রাহিম আজ সফল। দোকানের আয় থেকে চলে যাচ্ছে তার সংসার।

ক. সময় ব্যবস্থাপনা কী?

খ. জেন্ডার সমতার একটি গুরুত্ব বর্ণনা করো।

গ. ইব্রাহিমের সফলতার কারণটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'ভাগ্যই ক্যারিয়ার গঠনের সহায়ক'– নাসিমার ক্ষেত্রে এটি কি প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো।

২০১৮

তৃতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে সংযোগ স্থাপন ও আচরণ

এ অধ্যায় শেষে আমরা−

১. ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;

২. ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশল চিহ্নিত করতে পারব;

৩. ব্যক্তিগত আচরণে আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাবের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;

৪. কর্মে সফলতা অর্জনে মূল্যবোধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;

৫. সফল ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;

৬. সফল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হব;

৭. অন্যের বক্তব্য মনোযোগসহ শুনতে আগ্রহী হব এবং

৮. ক্যারিয়ার উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হব।

সংযোগ স্থাপন ও ক্যারিয়ার

যোগাযোগ স্থাপন বলতে প্রথমেই আমাদের চিন্তায় কী আসে একবার ভেবে দেখো তো। দুটো জিনিসকে সংযুক্ত করা কিংবা একাধিক বস্তুকে একসাথে যুক্ত করা, তাই না? ইলেকট্রনিকস হলে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে যুক্ত করা যেতে পারে, অন্য কোনো বস্তু হলে অন্য কোনোভাবে। কিন্তু একাধিক ব্যক্তিকে কি একসাথে যুক্ত করা যায়? তাহলে তোমরা অন্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে কীভাবে?

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সকল মানুষ পাশাপাশি একত্রে বসবাস করে। এই মানুষেরা কি পরস্পরের সাথে যুক্ত? এমন কী হতে পারে যে, সমাজের সকল মানুষ আসলে অদৃশ্য কোনো বন্ধনে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত? আমরা কি জানি– সেই অদৃশ্য বন্ধন কী?

কাজ : সুতোর বলের খেলা

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে গোল হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষক সুতোর বল কোনো একজন শিক্ষার্থীকে দিবেন। ওই শিক্ষার্থী সুতোর এক প্রান্ত ধরে রেখে তার পছন্দ বা ইচ্ছা অনুযায়ী সুতোর বলটি অন্য কাউকে দিবে। যাকে দিল সে সুতো ধরে রেখে সুতোর বলটি আবার অন্য আরেকজনকে দিবে। এভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাতে সুতো রেখে অন্যকে সুতোর বল দিবে। শ্রেণির সবাই সুতো পাবার পর, প্রত্যেকে যাকে সুতোর বল দিয়েছে তাকে দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করবে।

মানুষ হিসেবে আমরা একে অন্যকে যেমন শ্রদ্ধা করি, তেমনি দল-মত নির্বিশেষে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে চাই। পৃথিবীর সকল মানুষ আসলে মায়ার অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরিচিতজনদের প্রতি আমাদের এই মায়ার পরিমাণটা অনেক বেশি। আমরা আমাদের পরিচিতজনদের কাছাকাছি থাকতে চাই, সবসময় তাদের মঙ্গল কামনা করি। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, শুধু সামাজিক জীবনেই নয়, কর্মক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার বিদ্যমান। কর্মক্ষেত্রে সকলেই একটি অদৃশ্য বন্ধনে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

কর্মক্ষেত্রের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হলে অনেক কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে। সেসব শুধু বই পড়ে শেখা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। তাছাড়া, কর্মক্ষেত্রের বিশাল এক জগৎ থেকে নিজের পছন্দের কর্মক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে হলে চাই একে অপরের সাথে জানাশোনা ও বড়দের পথনির্দেশ।

এসো আমরা কয়েকজন মানুষের জীবনের ঘটনা শুনি:

কেস স্টাডি ১ : আশিস রঞ্জন দে কুমিল্লায় বাস করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে খুব পছন্দ করতেন। যেখানে যার সাথেই তার দেখা হতো, তিনি তাদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতেন। তাদের সাথে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। পড়াশোনা শেষ করার পর আশিস রঞ্জন দে একটি চাকরি পেলেন। কিন্তু তার ইচ্ছে ছিল, তিনি নিজের মতো করে একটা ব্যবসায় দাঁড় করাবেন। কী ব্যবসায় করলে ভালো হয়–তা নিয়ে তিনি পরিচিত মানুষের সাথে কথা বললেন। তার পূর্ব-পরিচিত ঢাকায় একজন নামকরা ব্যবসায়ীর কাছেও আশিস উপদেশ চাইলেন। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আশিসকে বললেন, 'ঢাকায় টাটকা সবজি পাওয়া খুব কঠিন। ঢাকার বড় বড় ডিপার্টমেন্টল স্টোরে সবজির নিয়মিত জোগান দিতে পারলে খুবই ভালো হয়।' এই ব্যবসার ভাবনাটা আশিসের ভালো লাগল। তিনি খোঁজ করে দেখলেন, ঢাকায় তার পরিচিত বেশ কয়েকজনের এ ধরনের ব্যবসায় রয়েছে। আশিস তাদের সাথে যোগাযোগ করে কোন ধরনের সবজি তাদের প্রয়োজন,

কেমন দাম তারা দিতে পারবেন এবং কী পরিমাণ চাহিদা ইত্যাদি জেনে নিলেন। তারপর, এলাকার কয়েকজন সবজি চাষির সাথে কথা বললেন। সবজি চাষিরা তাকে জানাল, সব সময় তারা ভালো দাম পায় না। আবার, অনেক সময় যখন সবজি বিক্রির সময় আসে তখন ক্রেতা না পাওয়ার কারণে সবজি নষ্ট হয়ে যায়। আশিস একটা ট্রাক ভাড়া নিয়ে সবজি ক্ষেত থেকে টাটকা সবজি সংগ্রহ করে ঢাকায় সবজির জোগান দেওয়া শুরু করলেন। সবাই খুব খুশি হলো। কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পেল। ঢাকার বড় বড় দোকানের মালিকরা ক্রেতাদের নিকট ভালো সবজি বিক্রি করতে পেরে খুশি। সবাই আশিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। আর তার ব্যবসায়ও ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

কেস স্টাডি ২ : চাঁদপুরের ছোট্ট একটি গ্রামে জান্নাতুল ফেরদৌস বাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে নিজের গ্রামেই একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংস্থার মাধ্যমে তিনি এলাকার মানুষকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। শিক্ষাজীবনে তাকে শিক্ষকেরা প্রায় বলতেন জীবনে উন্নয়নের জন্য সব সময় সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। এ কথা তিনি প্রায়ই মনে করেন। তাই তার পরিচিত সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। তিনি এখানে যাদের সঙ্গে পরিচিত হন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তিনি সব সময় তার এলাকার বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, শিশুদের ডায়রিয়া ও পানি বাহিত রোগের প্রকোপ, এগুলো নিয়ে ভাবতেন আর কীভাবে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার পথ খুঁজতেন। ঢাকার একটি সেমিনারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে তার পরিচয় ঘটে। এ পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। একদিন ঐ কর্মকর্তা জানালেন জান্নাতুলের সংস্থার মাধ্যমে তার এলাকার সমস্যা সমাধানে তারা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। পরবর্তী সময়ে জান্নাতুল তার এলাকার সমস্যা সমাধানে সক্ষম হলেন।

উল্লিখিত দুজন মানুষের জীবনের গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম? সম্পর্ক স্থাপন মানে চারপাশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া। তবে শুধু পরিচিত হলেই হবে না। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। কাজেই, সম্পর্ক স্থাপন হলো কারও সাথে পরিচিত হয়ে তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। আশিস ও জান্নাতুল ফেরদৌসের জীবনের গল্প থেকে আমরা জেনেছি যে, তাদের কর্মক্ষেত্রে সফল হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

সম্পর্ক স্থাপন অনেক রকম হতে পারে। যেমন–

- ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন (যেমন আমাদের সহপাঠীদের সাথে আমরা ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে থাকি; তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। বিপদে-আপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়াই)।
- পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন (পেশাগত প্রয়োজনে, আমাদের অনেকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। পেশাগত জীবনে সহকর্মীসহ অনেকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়)।
- সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন (একই সমাজে আমরা যারা বসবাস করি, তারা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকি)।

এছাড়াও সম্পর্ক স্থাপন আরও অনেক রকম হতে পারে। তবে যেখানে যেমনই হোক না কেন, সম্পর্ক স্থাপন মানেই হলো যোগাযোগ স্থাপন এবং তা নিয়মিত রক্ষা করে চলা। নিয়মিত যোগাযোগ না থাকলে স্থাপিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সম্পর্ক স্থাপন যে শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির হয় তা কিন্তু নয়। অনেক প্রতিষ্ঠান বা সংঘের সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। যেমন বাংলাদেশ জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তবে, এখানে আমরা শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়েই শিখব।

ক্যারিয়ারের সফলতায় সম্পর্ক স্থাপন

ক্যারিয়ার গঠন তথা জীবনে সাফল্যের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক চাকরি অভ্যন্তরীণভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না দিয়ে পরিচিত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। এভাবে দীর্ঘ নিয়োগ প্রক্রিয়ার খরচ বাঁচায় প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই জীবনে চলতে-ফিরতে পরিচিত হওয়া বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার। কে, কখন, কোন কাজের খবর দিতে পারে তা আগে থেকে বলা যায় না। তাই ক্যারিয়ারের ও সামাজিকতার স্বার্থে পারস্পরিক যোগাযোগ অপরিহার্য।

এখন দেখি ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে চাকরি পাওয়ার আগে এবং চাকরিরত অবস্থায় কাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে:

১. আশপাশে এবং স্কুল-কলেজে পরিচিতজন;

২. কোনো অনুষ্ঠান বা সামাজিক সম্মেলনে নতুন পরিচিতমুখ;

৩. আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব;

৪. অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

৫. প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ;

৬. কর্মরত প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক;

৭. ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়–

১। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী;

২। নিজ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী;

৩। গ্রাহক;

৪। ব্যবসায় অন্য যে সকল পণ্য বা সেবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল সে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি;

৫। স্থানীয় উদ্যোক্তা;

৬। স্থানীয় সরকারি প্রশাসন;

৭। বিজ্ঞাপন প্রচারকারী ও গণমাধ্যম।

২০২৫

সম্পর্ক স্থাপনে করণীয়:

- আন্তরিকতার সাথে কুশল বিনিময়;
- দেখা হলে কিছুটা সময় একসাথে আলাপ-আলোচনা করা ;
- বিপদে-আপদে পরিচিতজনদের খোঁজখবর নেওয়া ;
- সাধারণ আগ্রহের বিষয়ে সব সময় কথা বলা;
- ব্যক্তিগত কিন্তু গোপনীয় বা স্পর্শকাতর নয় এমন বিষয়ে কথা বলা;
- হাসিখুশি থাকা এবং কথায় ও কাজে আন্তরিকতা প্রকাশ করা;
- সামাজিক উৎসব এবং অনুষ্ঠানে খোঁজখবর নেওয়া ও শুভেচ্ছা বিনিময়;
- সমস্যায় পড়লে সাহায্য করা;
- সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা ।

ঘটনা : জামান সাহেব এবং আজহার সাহেব একই অফিসে দীর্ঘদিন যাবৎ চাকরি করছেন । তাদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান । অফিসের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও তাদের একে অপরের বাসায় যাতায়াত আছে । এই তো সেদিনই জামান সাহেবের মেয়ের জন্মদিনের দাওয়াতে গিয়েছিলেন আজহার সাহেব । পরস্পর ভালো সম্পর্ক থাকলেও তাদের আচরণগত কিছু পার্থক্য রয়েছে । জামান সাহেব কাজে কোনো প্রকার ফাঁকি দেন না । সময়মতো সব কাজ করে তিনি জমা দেন । তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেন । তাকে কীভাবে, কখন সহায়তা করবেন সে বিষয়ে জামান সাহেব অতি সতর্ক । অধঃস্তন কর্মকর্তাদের সাথেও তার সম্পর্ক খুব ভালো । অন্যদিকে আজহার সাহেব অত্যন্ত সৎ একজন কর্মকর্তা হিসেবে অফিসে সুপরিচিত । কোনো দিন তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কেউ পায়নি । তিনি অফিসে দেরি করে আসেননি । সহকর্মীদের সাথে তার সুসম্পর্ক রয়েছে । সাধারণত চায়ের আড্ডাগুলোতে তাকে খুব একটা মুখর হিসেবে দেখা যায় না । যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অধীনে তিনি কাজ করেন তার সাথে তিনি সর্বক্ষণ যোগযোগ করেন এমন নয় । তবে প্রতিদিন সব কাজ ঠিকমতো করে জমা দেন । একদিন সবাই শুনতে পেল জামান সাহেবের পদোন্নতি হয়েছে ।

২০২১

> **কাজ**
>
> জামান সাহেবের পদোন্নতিতে কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

এসো ভালো শ্রোতা হই

যোগাযোগ রক্ষায় ভালো শ্রোতা হওয়া খুবই জরুরি। কোনো কিছু শোনা মানেই ভালো শ্রোতা হওয়া নয়। ভালো শ্রোতা অন্যের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন এবং যা শোনেন তা নিয়ে ভাবেন। আমাদের চারপাশে অনেকেই প্রচুর কথা বলেন এবং অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন না বা খানিকটা শুনলেও তা ভাবনা-চিন্তার গভীরে নেন না। এরা কোনোভাবেই ভালো শ্রোতা নন। ভালো শ্রোতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা দেখে বোঝা যায় যে তিনি ভালো শ্রোতা। যেমন–

- একজন ভালো শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে বক্তার বক্তব্য শোনেন; শোনার সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন না।
- একজন ভালো শ্রোতা সাধারণত বেশির ভাগ সময় বক্তার চোখে চোখ রেখে তার বক্তব্য শোনেন।
- একজন ভালো শ্রোতা বক্তব্যের সাথে একাত্ম হয়ে যান। তিনি যা শুনছেন সে অনুযায়ী তার অভিব্যক্তি (যেমন– মৃদু হাসা, অবাক হওয়া, দুঃখের অভিব্যক্তি দেওয়া ইত্যাদি) পরিবর্তন হয়।
- একজন ভালো শ্রোতা অন্যের কথা বলার সময় নিজে কথা বলেন না। সময় ও সুযোগ বুঝে অথবা অন্যের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে তিনি কথা বলেন।
- একজন ভালো শ্রোতা কারও বক্তব্য শোনার সময় হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন না।

এখন ভেবে দেখো তো তোমাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না? আমাদের সবার মধ্যেই ভালো শ্রোতা হওয়ার গুণাবলি কম-বেশি রয়েছে। আমাদেরও উচিত ভালো শ্রোতা হওয়ার চেষ্টা করা। কারণ, কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য ভালো শ্রোতা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

> **যাচাই করে দেখি আমরা কতটা ভালো শ্রোতা।**
>
> নিচের প্রশ্ন বা বাক্যগুলো (ক্রমিক ১ থেকে ১০) পড়ো এবং তুমি যে আচরণ করো, সে অনুযায়ী ক, খ, গ, ঘ, ঙ-এর উপর √ চিহ্ন দাও। এখানে–
>
> ক = কখনো করি না =১
>
> খ = সব সময় করা হয় না =২
>
> গ = ইচ্ছে হলে করি, না হলে করি না =৩
>
> ঘ = বেশির ভাগ সময়ই করি =৪
>
> ঙ = সব সময় করি =৫
>
> নিচের বিবরণগুলো পড়ে √ চিহ্ন দেওয়া শেষ হলে, সমীকরণে বসিয়ে মান বের করো এবং মান অনুযায়ী মন্তব্য জেনে নাও।

ক্রম	বিবৃতি	কখনো করি না	সবসময় করা হয় না	ইচ্ছে হলে করি, না হলে করি না	বেশির ভাগ সময়ই করি	সবসময় করি
		ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১	কেউ যখন কথা বলে তখন আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
২	যখন কেউ কথা বলে তখন আমি অন্য কোনো কাজ (যাতে করে মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে) করা থেকে বিরত থাকি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৩	কোনো কিছু বা কারও কোনো কথা শোনার আগেই আমি মনে মনে ঠিক করে নিই, তা থেকে আমি কী জানতে চাই	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৪	কেউ যখন কথা বলে তখন আমি অন্যদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৫	কোনো কিছু শুনে আমি সেখান থেকে প্রধান শব্দসমূহ মনে গেঁথে নিই, যাতে বিষয়বস্তু আমার মনে থাকে	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৬	সম্ভব হলে শোনার সাথে সাথে আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নোট নেওয়ার চেষ্টা করি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৭	কোনো বিষয়বস্তু শুনে বুঝতে না পারলে, আমি বক্তাকে সে বিষয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন করি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৮	কোনো কিছু শোনার সময় আমি বক্তার চোখের দিকে চেয়ে থাকি, যাতে তার অভিব্যক্তি আমি বুঝতে পারি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
৯	কারও কথা বলার সময়ে, অযথাই তার দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে নেওয়া বা নেওয়ার চেষ্টা থেকে আমি বিরত থাকি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
১০	কোনো কিছু শোনার সময় আমি তার প্রেক্ষাপট বোঝার চেষ্টা করি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ

দশটি বাক্যের উত্তরে তুমি ক, খ, গ, ঘ, ঙ-এর উপরে কয়টি √ দিয়েছ তা গণনা করে নিচের সমীকরণে বসাও এবং তোমার স্কোর বের করো। তোমার স্কোর = ১ x (যে কয়টি 'ক'-এর উপর √ দিয়েছ, সেই সংখ্যা) + ২ x (যে কয়টি 'খ' এর উপর √ দিয়েছ, সেই সংখ্যা) + ৩ x (যে কয়টি 'গ'-এর উপর √ দিয়েছ, সেই সংখ্যা) + ৪ x (যে কয়টি 'ঘ'-এর উপর দিয়েছ, সেই সংখ্যা) + ৫ x (যে কয়টি 'ঙ'-এর উপর √ দিয়েছ, সেই সংখ্যা)

তোমার স্কোর যদি–

১০ থেকে ২০ হয় : তুমি অমনোযোগী ।

২০ থেকে ৩০ হয় : তোমার আরও মনোযোগ প্রয়োজন ।

৩০ থেকে ৪০ হয় : তুমি মনোযোগী ।

৪০ থেকে ৫০ হয় : তুমি অত্যন্ত মনোযোগী ।

১০১৮

ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশল

উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা

একজন গুণী মানুষ যেমন উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজ শুরু করেন না, তেমনি একজন ভালো শ্রোতাও গঠনমূলক কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কথায় কর্ণপাত করেন না। একজন ভালো শ্রোতা শোনার আগেই ঠিক করে নেন, কী কী তথ্য তার প্রয়োজন এবং কীভাবে সেই সকল তথ্য তিনি মনে রাখবেন। মনে রাখার জন্য একজন ভালো শ্রোতা বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করে থাকেন; যেমন মুখ্য শব্দ মনে রাখার কৌশল (এক্ষেত্রে শ্রোতা মুখ্য শব্দসমূহ মনে রাখেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জ্ঞান হিসেবে তার পূর্বে শেখা বিষয়ের সাথে একীভূত করে নেন)। তবে, অধিক তথ্যের ক্ষেত্রে শ্রোতা সেগুলোকে নোট করে বা টুকে নেয়। শোনার আগেই যদি উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়া যায়, কিংবা কী কী তথ্য জানা প্রয়োজন তা ঠিক করে নেওয়া যায় তবে শোনা তথ্য মনে রাখা সহজ হয়।

মনোনিবেশ করা

ভালো শ্রোতা হতে হলে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শোনা সহজ ব্যাপার নয়; এজন্য অনুশীলন ও চেষ্টার প্রয়োজন। অনেকের ক্ষেত্রেই কখনো কখনো কারো কথা বা বক্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকে আবার খুব দ্রুত অন্যের বক্তব্যের গভীরে মনোনিবেশ করতে পারেন। এজন্য চেষ্টা ও অনুশীলন প্রয়োজন।

মানসিক ও শারীরিকভাবে স্থির থাকা

ভালো শ্রোতা হতে হলে কোনো কিছু শোনার সময় মানসিক ও শারীরিকভাবে স্থির থাকতে হবে। কেউ যখন কথা বলেন বা বক্তব্য প্রদান করেন, তখন অনেকেই বিভিন্ন রকম কাজ করেন, নানা রকম চিন্তা-ভাবনা করেন। এ রকম অবস্থায় মনোযোগ দিয়ে শোনা যায় না। কাজেই মনোযোগী শ্রোতা হতে হলে কোনো কিছু শোনার সময় অবশ্যই আগ্রহ থাকতে হবে এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে স্থির থাকতে হবে।

চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা

আমাদের দেশে গুরুজনদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা বা কথা শোনাকে অনেকেই অভদ্রতা মনে করে থাকেন। কিন্তু কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শোনার ক্ষেত্রে চোখের মাধ্যমে যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রোতা বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারেন; বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে মানসিক যোগাযোগ তৈরি করতে পারেন। ফলে, শোনা বিষয়টি অনেক অর্থবহ হয়।

কথার মাঝে কথা না বলা

অন্য কেউ যখন কথা বলেন, তখন আমাদের কথা বলা উচিত নয়। কেউ কথা বলার সময় যদি আমরা কথা বলি, তবে একদিকে আমরা যেমন তার কথা ভালোভাবে শুনতে পারি না; তেমনি তিনিও আমাদের কথা শুনতে পারেন না। কাজেই মনোযোগী শ্রোতা হতে হলে অন্যরা যখন কথা বলেন তখন নিজে নিশ্চুপ থেকে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। একজনের কথা বলা শেষ হলে তারপর নিজে কথা বলতে হবে।

এ সকল উপায় আমরা যদি নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের আচরণে পরিণত করি, তবেই আমরা ভালো শ্রোতা হয়ে উঠতে পারব। জীবনে বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার জন্য ভালো শ্রোতা হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

> **কাজ**
>
> অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার ক্ষেত্রে তোমার আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা করো।

ব্যক্তিগত আচরণ

ব্যক্তিগত আচরণ কার্যকর সংযোগ স্থাপনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্যারিয়ারে সফলতা অর্জনে ব্যক্তিগত আচরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যক্তিগত আচরণ বলতে আসলে কী বোঝায়? ব্যক্তিগত আচরণ হলো– আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে চাইলে আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ অবশ্যই পরিশীলিত হতে হবে; আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ এমন হতে হবে যা অন্যের নিকট কেবল গ্রহণযোগ্যই নয়, বরং প্রশংসার দাবিদার। এসো একটি ঘটনা যাচাই করি-

হাসান আলি একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় ফিল্ড সুপারভাইজার পদে চাকরি করেন। তার দায়িত্ব হলো মাঠকর্মীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা। একবার একজন মাঠকর্মীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। হাসান আলি সাহেব এই দুর্নীতির বিষয়ে অবগত হয়ে তার সত্যতা যাচাই করে দেখলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি ঐ মাঠকর্মীকে ডাকলেন এবং কেন দুর্নীতি করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে বললেন। অভিযুক্ত মাঠকর্মী ইনিয়ে-বিনিয়ে তার অভাব ও নানা সমস্যার কথা বলতে লাগলেন। হাসান আলি আবেগের বশবর্তী না হয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিলেন। ফলে আর কোনো মাঠকর্মী বা অন্য কোনো কর্মী কোনোরকম দুর্নীতিতে জড়ালেন না। এতে একদিকে যেমন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে হাসান আলি সাহেবের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল, তেমনি সংস্থার ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হলো। তিনি যদি দুর্নীতিবাজ কর্মীর বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা না নিতেন, তবে হয়তো ঐ অভিযুক্ত মাঠকর্মী আরও বড় ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়তেন। এতে একদিকে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতো, অন্যদিকে স্থানীয় জনগণও ক্ষতির সম্মুখীন হতো।

এ তো গেল, কর্মজীবনের কথা। কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশের আগেও আবেগ, অনুভূতি ও মনোভাবের পরিশীলিত অনুশীলন প্রয়োজন।

আবেগ

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আবেগ আছে। মানুষ কখনো খুব খুশি হয়, আনন্দে লাফিয়ে ওঠে; কখনো ক্ষুব্ধ হয়, কখনো বিষণ্ন হয়। মানুষের এই আনন্দ-বেদনা প্রকাশের যে উপায় এগুলোই হচ্ছে আবেগ। আবেগ মানুষের বিশেষ মানসিক অবস্থা। মানুষের অনুভূতি মিশ্রিত মানসিক অবস্থাকে আবেগ বলে।

আমাদের দেশকে যে আমরা গভীরভাবে ভালোবাসি, এটি এক ধরনের আবেগ। আবার কোনো কিছু আমরা পছন্দ করি বা অপছন্দ করি সেটাও এক ধরনের আবেগ। আমাদের স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখতে আবেগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আবেগ আমাদের বাস্তব জীবনে চারপাশের মানুষের সাথে সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবেগ সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। তবে কোনো বিষয় যদি বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত হয়, কিংবা কোনো দর্শন-নির্ভর হয়, সেক্ষেত্রে ঐ বিষয় সংক্রান্ত আবেগ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবেগের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু কিংবা সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক কেমন তা অনেকটাই নির্ভর করে তাদের প্রতি আমাদের আবেগিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন তার উপর। কর্মক্ষেত্রে আবেগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত যখন দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মানবোধ, সহমর্মিতা, বিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদি আবেগিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল।

আবেগ নিয়ন্ত্রণ

আবেগের ভালো মন্দ দিক দুটোই আছে। ইতিবাচক আবেগ যেমন মানুষকে বিকশিত করতে সাহায্য করে, তেমনি নেতিবাচক আবেগ মানুষকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। তাই আবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। আবেগাপ্লুত অবস্থায় মানুষ কোনো যুক্তি মানতে চায় না। ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে নিজের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করাই আবেগ নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ আবেগে ভেসে না গিয়ে যৌক্তিকভাবে আচরণ করাকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ বলে।

আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

জীবনে উন্নতি করতে বা প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলে অবশ্যই আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভয়, রাগ, হিংসা, ঈর্ষা, হতাশা ইত্যাদি ক্ষতিকর আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস ও ক্রমাগত অনুশীলন। কখনো বিষণ্ন থাকা চলবে না। মনে রাখতে হবে বাল্যকাল ও কৈশোর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। এসময় কোনো ভারী দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং লেখাপড়ায় ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। সময় পেলে পাঠ্যবই ছাড়াও ভালো ভালো বই পড়তে হবে, বেড়াতে যেতে হবে, খেলাধুলা করতে হবে। মা-বাবার কাছে বিপদ বা সমস্যার বিষয়ে সব খুলে বলতে হবে। ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয়, হতাশা এগুলো আবেগের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। এ ধরনের নেতিবাচক বা ক্ষতিকর আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায় হচ্ছে :

১. ক্রোধ, ভয় বা হতাশার সঠিক কারণ চিহ্নিত করা;

২. কারণটি/কারণগুলো দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া;

৩. নির্ভরযোগ্য আত্মীয়, নিকটজন, শিক্ষক, বন্ধু এদের সাথে বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা;

৪. নির্ভরযোগ্য এবং নিজেকে ভালোবাসেন এমন ব্যক্তির দেওয়া পরামর্শ মেনে চলা;

৫. ভয় বা হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা;

৬. রাগী বা ক্রুদ্ধ মানুষকে কেউ পছন্দ করে না, এ কথা সবসময় মনে রাখা।

নিয়ন্ত্রিত আবেগ জীবনকে সুন্দর করে, উপভোগ্য করে। অতিরিক্ত আবেগ দ্বারা চালিত হলে নানা রকম ক্ষতি হতে পারে। তাই আবেগ সামলে চলা ও নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কাজ

"মাত্রাতিরিক্ত আবেগ পেশাগত জীবনের জন্য ক্ষতিকর"-যুক্তি দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করো।

অনুভূতি

আবেগের চেয়ে অনুভূতি তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী। কোনো বিষয়, কোনো ঘটনা আমাদের মনের গভীরে বা হৃদয়ের গহিনে যে ভাব তৈরি করে, তাই হলো অনুভূতি। আবেগ আমাদের মনে অনুভূতির জন্ম দেয়।

যেমন আমাদের আপনজনদের প্রতি আমাদের স্থায়ী ভালোবাসার অনুভূতি রয়েছে। কোনো কাজ যখন আমাদের ভালো লাগে, তখন সেই কাজের প্রতি আমাদের ভালোলাগার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, যা আমাদের ওই কাজে লেগে থাকতে বা ঐ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কোনো নতুন বিষয় যখন আমাদের সামনে আসে, কোনো নতুন ঘটনা যখন আমাদের সামনে ঘটে তখন সেই বিষয় বা ঘটনার প্রতি তাৎক্ষণিক অনুভূতি আমাদের মধ্যে এক ধরনের আবেগের জন্ম দেয়।

কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক তৈরিতে অনুভূতির গুরুত্ব অনেক। আমরা যখন কোনো চাকরি পাওয়ার জন্য কোনো ধরনের মৌখিক পরীক্ষা দেই, তখন যারা পরীক্ষক হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত থাকেন, আমাদের আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি তাদের মনেও এক ধরনের অনুভূতির জন্ম দেয়। তারা যখন কোনো প্রার্থীকে চাকরির জন্য নির্বাচন করেন, তখন তাদের সেই অনভূতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা পালন করে।

মনোভাব

কোনো বিষয়, ঘটনা বা মতবাদ সম্পর্কে আবেগ ও অনুভূতির ফলে আমাদের মনে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাই হলো মনোভাব। কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনোভাব দুই রকম হতে পারে—ইতিবাচক মনোভাব ও নেতিবাচক মনোভাব। ইতিবাচক মনোভাব যেমন সাফল্যকে ত্বরান্বিত করে তেমনি নেতিবাচক মনোভাব সাফল্যকে করে বাধাগ্রস্ত। নেতিবাচকের চেয়ে ইতিবাচক কর্মকাণ্ড ও মনোভাব সবার কাছেই বেশি গ্রহণযোগ্য। কেউ যদি সত্যিই সফল হতে চান সেক্ষেত্রে তার প্রথম কাজ হবে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা। একটি গল্প হয়তো আমাদের অনেকের জানা। কোনো জুতা কোম্পানির দুজন বিক্রেতাকে পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছিল এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে জুতার সম্ভাব্য বাজার নির্ধারণ করতে। একজন এসে বলেন যে, ওখানে জুতার কোনো বাজারই নেই। পাঁচ হাজার লোকের বসবাস সেখানে কিন্তু কেউ জুতা পায়ে দেয় না। অপরজন বলেন যে, ওখানে জুতার বাজারের বিপুল সম্ভাবনা কারণ পাঁচ হাজার লোকের কেউই জুতা পায়ে দেয় না। তোমরা কি বলতে পার, এই দুজনের মধ্যে কার মনোভাব ইতিবাচক আর কার নেতিবাচক?

একজন নিরাশাবাদী মানুষ অনেক সম্ভাবনার মধ্যেও সমস্যা খুঁজে বের করতে পারেন। আর একজন আশাবাদী মানুষ অনেক সমস্যার মধ্যেও খুঁজে বের করতে পারেন সম্ভাবনা। যখন তুমি কোনো কাজে নেতৃত্ব দেবে তখন ইতিবাচক মনোভাব না থাকলেও হয়তো কাজটি সম্পন্ন হবে কিন্তু তোমার ইতিবাচক মনোভাব সবাইকে তার নিজের সবচেয়ে ভালো কাজটুকু করতে উৎসাহিত করবে। ইতিবাচক মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য খুবই দরকার। তাই আমরা কী করে আরও বেশি ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হতে পারি, এসো সেই উপায়গুলো জেনে নিই :

লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে কাজ করা

কোনো কাজ শুরু করার আগে ভাবো এটি কীভাবে তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যদি তোমার কাজ আর লক্ষ্যের মধ্যে মিল না থাকে তবে তা না করাই ভালো। উদ্দেশ্যহীন কাজ শুধু তোমার সময় আর শক্তিই নষ্ট করবে।

লক্ষ্যে অবিচল থাকা

সাধারণত জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং মানুষ যেমন ফলাফল চায় সে অনুযায়ী তাকে পরিকল্পনা করতে হয়। কিন্তু আগে থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ফল আশা করা এক ধরনের বোকামি। কোনো কারণে প্রত্যাশিত ফল অর্জন না হলে তা হতাশার জন্ম দেয়। নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা চালাতে হবে। যদি সফলতা একবারে না আসে, তবে বার বার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি

মানুষ তার অজান্তেই চারপাশের মানুষ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যকে মানুষ অনুকরণও করে। এ কারণে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে মেলামেশা করলে তার প্রভাব পড়বে। আর নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে মিশলে দৃষ্টিভঙ্গিও নেতিবাচক হবে। তাই সব সময় ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে মেশা উচিত।

অন্যদের অক্ষমতা সহজভাবে নেওয়া

সবার কাজ করার ক্ষমতা একই রকম হয় না। যেভাবে তুমি একটি কাজ করতে পারতে ঠিক সেভাবে অন্য কেউ নাও করতে পারে, তাই এটি নিয়ে মন খারাপ করা বা কারও সাথে তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা বা খারাপ মন্তব্য করা ঠিক নয়। এটা এক ধরনের হীনম্মন্যতা।

অন্যের কাজের প্রশংসা করা

কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি হবে তখনই যখন তুমি জীবনের ছোট ছোট দুঃখ-কষ্টগুলোকে সরিয়ে প্রাপ্তিগুলোকেই বড় করে দেখবে। অন্যদের দেওয়া উপহারগুলোর জন্য হাসিমুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। অন্যকে তাদের কাজের প্রশংসা করতে ভুলবে না।

কর্মে সফলতায় মূল্যবোধ

আমরা জেনে অবাক হব যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন একটি অফিসের কেরানি হিসেবে।

"Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value"- **Albert Einestein**

সেই আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি থেকেই বোঝা যায় কর্মে সফলতায় মূল্যবোধ কতটা জরুরি। আইনস্টাইন আমাদেরকে কেবল সফলতার পেছনে না দৌড়িয়ে, মূল্যবোধ অর্জন করতে বলেছেন। মূল্যবোধই একজন মানুষকে প্রকৃত কর্মে সফলতা এনে দিতে পারে, সকলের নিকট সম্মানীয় একজন মানুষ হিসেবে সমাজে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। প্রবাদে আছে–"দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য"। আইনস্টাইনের কথায় কিংবা বাংলা প্রবাদে কেন মূল্যবোধকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কীভাবেই বা মূল্যবোধ আমাদের কর্মে বা কর্মক্ষেত্রে সফল হতে সাহায্য করে, সে বিষয়ে আমরা জানব।

কর্মক্ষেত্রে মূল্যবোধের কতগুলো ক্ষেত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করব–

নির্ভরশীলতা ও আস্থা : কর্মক্ষেত্রে আমাদের দলগত কাজ করতে হয়। দলগত কাজের ক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা তাদের সাথেই দলগত হয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি যাদের উপর আমরা আস্থাশীল হতে পারি, যাদের কোনো কাজ বা দায়িত্ব দিয়ে তাদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি। তোমরা খেয়াল করলে দেখবে– তাদের সাথেই তোমাদের বন্ধুত্ব হয়, যাদের তোমরা বিশ্বাস করো; যাদের আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তা, স্বভাব তোমাদের ভালো লাগে; যাদের উপর তোমরা নির্ভর করতে পার। কর্মক্ষেত্রও এর থেকে আলাদা নয়। কর্মক্ষেত্রেও সবাই তাদের সাথে দল গঠন করতে চায়, যারা দক্ষ এবং যাদের মূল্যবোধ উন্নত, সর্বোপরি যাদের উপর কোনো দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সততা : ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যেমন সততা অমূল্য, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও এর মূল্য অপরিসীম। সবাই সৎ লোকের সহকর্মী হতে চায়, সৎ লোককে কোনো কাজ বা চাকরি দিতে চায়। যারা অসৎ, তাদের সবাই ঘৃণা করে, সবাই তাদের থেকে দূরে থাকতে চায়। চাকরিদাতা বা নিয়োগকর্তাদের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একজন চাকরি-প্রার্থীর সততা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। আজকাল চাকরিদাতাগণ অত্যন্ত সচেতন

এবং তারা চাকরি-প্রার্থীদের সততার মাত্রা নির্ধারণে বিশেষভাবে দক্ষ। কাজেই কারও যদি মনের ভেতর অসততা থাকে তবে চাকরিদাতাগণ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। ওই চাকরি-প্রার্থী যতই দক্ষ হোক না কেন তাকে চাকরিতে নিয়োগ দেন না। ব্যবসার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য; কেউই অসৎ ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন করতে চায় না।

নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা : প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই কিছু নিয়ম-কানুন আছে। কর্মক্ষেত্রে সফল হতে হলে আমাদের অবশ্যই ঐ সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা উন্নত মূল্যবোধের অংশ; একজন উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সব সময় নিয়মানুবর্তী ও সুশৃঙ্খল হয়ে থাকেন। তিনি যে সমাজে বাস করেন, যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, সেই সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম-কানুন তিনি মেনে চলার চেষ্টা করেন।

সময়ানুবর্তিতা : কর্মক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের কাজ সময়ে করা খুবই জরুরি। এ কথার উপলব্ধি রয়েছে লালনের গানে– 'সময় গেলে সাধন হবে না'। কর্মক্ষেত্রে সবাই দলগতভাবে কাজ করে। একজন যদি সময়ম কর্ম সম্পাদন না করে, তাহলে সে জন্য সকলেই বিপদে পড়তে পারেন। এ ছাড়া সময়মতো অফিসে যাওয়া, কিংবা সময়মতো ব্যবসার কাজ শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো প্রতিটি কাজ শেষ করতে পারলে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়ে যায়।

পারস্পরিক সহমর্মিতা ও বিশ্বাস : কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও বিশ্বাস ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে যদি পারস্পরিক সহমর্মিতা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে তারা সৃজনশীল কোনো কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে না। এছাড়া, দলবদ্ধ হয়ে কাজের ক্ষেত্রে দলের সবাইকে দায়িত্ব নিতে হয়; কোথাও কারও দুর্বলতা থাকলে নিজে এগিয়ে গিয়ে তাকে সহায়তা করা উচিত।

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণ

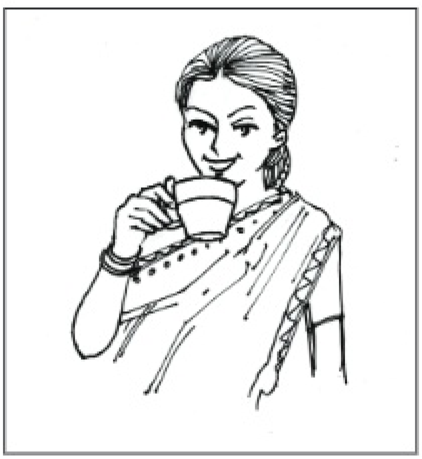

আচরণ যা স্বাভাবিক

আচরণ যা করা উচিত না

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত আচরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তোমার ভেতরে কী আছে তা প্রকাশ পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো তোমার আচরণ। কোনো মানুষ সৎ না অসৎ তা আমরা তার আচরণের মাধ্যমেই বুঝতে পারি। বদমেজাজি ব্যক্তিকে আমরা পছন্দ করি না। কারণ, তার আচরণ আমাদের স্বস্তি দেয় না। বরং বিরক্তির উদ্রেক করে। পেশাগত জীবনে ভালো করার জন্য আচরণ সংযত ও ভদ্র হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় খুব বেশি দূর এগোনো সম্ভব নয়। শুধু ব্যক্তিগত সদাচরণ দিয়ে অনেক সাধারণ মানুষ অসাধারণ সব পদে কাজ করে চলছেন, ছোট উদ্যোক্তা থেকে বিশাল শিল্প-কারখানার মালিক হয়েছেন। ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত আচরণ মার্জিত ও উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা, কর্মজীবনের কোনো না কোনো সময়ে সমস্যা হবে, বাধা আসবে।

আমাদের মন-মানসিকতা, অভ্যাস, বদভ্যাস সবই প্রকাশ পায় আচরণের মধ্য দিয়ে। 'অভদ্রভাবে কথা বলে' এমন কাউকে কোনো প্রতিষ্ঠানই চাকরি দিতে চাইবে না। বরং বিনয়ী এবং ভদ্র কাউকেই মানুষ চাকরি দিয়ে থাকেন। চাকরি, ব্যবসায় ইত্যাদি পেশাগত জীবন গঠনে যে সকল ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে তা হলো:

- ❖ বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, পরিচ্ছন্ন;
- ❖ সময়ের ব্যাপারে সচেতন এবং কথা ও কাজের মধ্যে মিল;
- ❖ ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন উভয় সহকর্মীদের সাথে বিনয়ী হওয়া;
- ❖ জটিল পরিস্থিতিতে রেগে না যাওয়া বা বিরক্তি প্রকাশ না করা বরং হাসিমুখে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া;
- ❖ চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় কিংবা নিজ প্রতিষ্ঠানে কোনো গ্রাহকের সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করা;
- ❖ জনসম্মুখে ব্যক্তিগত কাজ না করা;
- ❖ বিপরীত জেন্ডারের সহকর্মীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন;
- ❖ সবার সাথে হাসিমুখে আন্তরিকতার সাথে কথা বলা;
- ❖ কোনো সমস্যায় পড়লে সরাসরি সহকর্মীদের সহায়তা চাওয়া এবং তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রাখা;
- ❖ নিজের অপারগতা সহজভাবে প্রকাশ করা; তবে চেষ্টা না করেই প্রথমে অপারগতা প্রকাশ না করা;
- ❖ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভয় না পেয়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা;
- ❖ নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা সব সময় সবার কাছে না বলা;

ভূমিকাভিনয়

শ্রেণিকক্ষে একটি নাটকের আয়োজন করা হবে। অফিসের পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীরা পরস্পর সহকর্মীর চরিত্রে অভিনয় করবে। একজন শিক্ষার্থী আদর্শ আচরণকারীর চরিত্রে অভিনয় করবে এবং অন্য একজন যে সকল আচরণ করা যাবে না তা অভিনয় করে দেখাবে। অতঃপর তাকে সঠিক আচরণ শেখানোর জন্য অপর একজন শিক্ষার্থী বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করবে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে চরিত্র নির্বাচন করবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনো কিছুর প্রতি আমাদের ভালোলাগা বা মন্দলাগাকে কী বলে?

ক. আচরণ	গ. মনোভাব
খ. আবেগ	ঘ. আস্থা

২. কর্মে সফলতা অর্জনের জন্য নিচের কোন মূল্যবোধটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপুর্ণ ?

ক. সততা	গ. সময়ানুবর্তিতা
খ. নিয়মানুবর্তিতা	ঘ. নান্দনিকতা

৩. অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো, এটি–

i. আবেগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী

ii. ঘটনা বা মতবাদ সম্পর্কে আমাদের আবেগের ফল

iii. নিরাশাবাদী মানুষকেও অনেক সময় উজ্জীবিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i.	গ. iii.
খ. ii.	ঘ. i ও ii.

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জেসমিন তার পরিবারে ও অফিসে সহনশীল আচরণ করেন। তবে মাঝেমধ্যে সহকর্মীদের আচরণে তীব্র প্রতিক্রিয়াও দেখান। কোনো কাজ ভালো লাগলে তিনি যেমন প্রশংসা করেন তেমনি খারাপ লাগলেও প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেন না।

৪. জেসমিনের এ বৈশিষ্ট্যকে কী বলা হয়?

ক. ভাবমূর্তি গ. মনোভাব
খ. অনুভূতি ঘ. আবেগ

৫. এ বৈশিষ্ট্যের কারণে জেসমিন পারেন–

i. কর্মক্ষেত্রে সহমর্মিতা পেতে
ii. সহকর্মীদের খারাপ আচরণের সম্মুখীন হতে
iii. সকলের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i. গ. iii.
খ. ii. ঘ. i ও iii.

সৃজনশীল প্রশ্ন

নুসরাত জাহান বাংলাদেশের ছোট্ট একটি শহরের মেয়ে। লাজুক স্বভাবের মেয়ে নুসরাত কারো দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না। একটি কলেজ থেকে তিনি মনোবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করেছেন। নুসরাত বেশ বুদ্ধিমতী; তিনি যা করেন তা খুব মনোযোগ দিয়ে করেন। সফল হওয়ার জন্য তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে প্রস্তুত। তিনি বেশ কয়েকটি চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন যেগুলোর মধ্যে কয়েকটিতে সাক্ষাৎকার ও লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চাকরি হয়নি। চাকরি না হওয়াতে নুসরাতের মন খারাপ হলেও, ভেঙে পড়েননি। বরং তিনি চাকরি না হওয়ার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। নুসরাতের মনে হয়েছে যে, অন্য প্রতিযোগীর তুলনায় ইংরেজি ও কম্পিউটার ব্যবহারে তিনি দুর্বল। তাছাড়া সাক্ষাৎকারের সময় আচরণের একটি দুর্বল দিকও তার মনে পড়ে।

ক. মনোভাব কী ?

খ. সততা বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

গ. সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নুসরাতের আচরণের দুর্বল দিকটি বর্ণনা করো।

ঘ. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নুসরাতের দুর্বলতাটি কি সত্যিই একটি দুর্বলতা? বিশ্লেষণ করো।

২০২৩

চতুর্থ অধ্যায়

আমি ও আমার কর্মক্ষেত্র

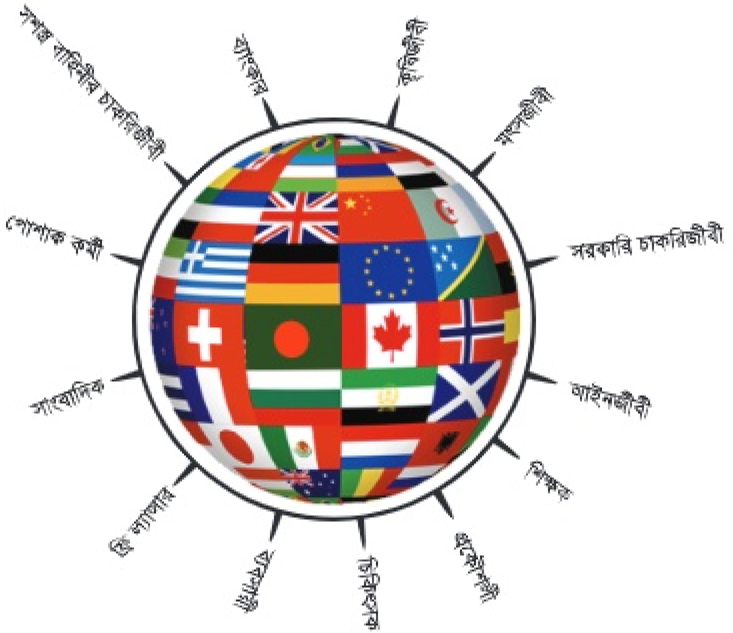

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

১. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব;

২. আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশিদের কাজের সুযোগ-সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব;

৩. চাকরি/পেশা/কাজ খুঁজে পেতে গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;

৪. আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;

৫. চাকরিতে আবেদন করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;

৬. কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কৌশল বর্ণনা করতে পারব;

৭. গণমাধ্যম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারব;

৮. বিদ্যালয়ে আয়োজিত ক্যারিয়ার মেলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারব;

৯. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্যারিয়ার সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহী হব এবং

১০. ক্যারিয়ারকে সুসংহত রাখা এবং আরও সমৃদ্ধ করার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হব ।

বাংলাদেশে বিদ্যমান কর্মক্ষেত্রসমূহ

সময় গতিশীল। সময়ের এই গতিময়তার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সমাজ, পরিবর্তিত হয় আমাদের চারপাশ, কাজের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট। আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষিকাজ কিংবা কৃষিভিত্তিক শিল্পে শ্রম দেওয়া। আজ বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। আজকের দিনে আমাদের দেশে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কী কী ধরনের কাজের সুযোগ আছে, কোন কোন পেশা গ্রহণ করা সম্ভব তা এই পাঠ থেকে আমরা জেনে নেব। পাশাপাশি, আমাদের জন্য ভবিষ্যতে কী ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে, সে বিষয়েও জানার চেষ্টা করব। কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে গভীরভাবে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তবেই আমরা স্বপ্ন ও আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশা গ্রহণ করতে পারব।

স্থানীয় পর্যায়

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি এদেশের প্রকৃতির মতোই বৈচিত্র্যময়। বাংলাদেশ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে অনেকেই বলে থাকেন যে আমাদের দেশে স্থানীয় পর্যায়ে কাজের সুযোগ কম। কথাটা মোটেও সত্য নয়। বহুকাল থেকেই বাংলাদেশের সমাজ স্থানীয় পর্যায়ে অনেক পরিশীলিত ও বৈচিত্র্যময় কর্মক্ষেত্রের সমাবেশে ঐশ্বর্যশালী। প্রত্যেক গ্রামেই ছিল কুমার, চাষি, কামার, জেলে, ব্যবসায়ী, শিক্ষকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। তারা বংশপরম্পরায় ও নিজের আগ্রহের ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন করতেন। নিজের মেধা, শ্রম ও ক্ষমতার সবটুকু উজাড় করে তারা গতিময় করেছিলেন দেশের অর্থনীতি। আমাদের চারপাশে এখনো ছড়িয়ে আছে সেসব পেশা। এসব পেশায় গিয়ে সুনাম অর্জনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু একটু চোখ মেলে দেখা, খানিকটা মেধা ও সৃজনশীলতা খাটিয়ে নতুন রূপে নিজের ভবিষ্যৎকে সাজিয়ে নেওয়া।

এবার আমরা স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল পেশা গ্রহণের সুযোগ আছে, সেগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।

কৃষিকাজ : কৃষিকাজ পৃথিবীর আদিম পেশাগুলোর একটি। মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্বের সকল দেশের মতো এদেশেরও কোটি কোটি কৃষক রাত-দিন শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই কৃষিকাজকে হেয় করে দেখে, ভাবে এটা গুরুত্বহীন কাজ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষিকাজ একটি দারুণ লাভজনক পেশা। আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে, কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ওইসব দেশের মানুষ নিজের গ্রামে ফিরে কৃষিকাজ করেন। তারা অবশ্য আমাদের মতো অসচেতনভাবে কৃষিকাজ করে না। তারা চাষ করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এবং তাদের ফলনও হয় অনেক বেশি। ফলে সেসব দেশ, তাদের অভ্যন্তরীণ খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকেন। বাংলাদেশকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে নিয়ে যেতে পারেন এদেশের কৃষকগণ।

বাংলাদেশের মতো এমন উর্বর ভূমি পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। কাজেই দেশের এখন প্রয়োজন আধুনিক কৃষক। আমরা কি হতে পারব আধুনিক কৃষক? আধুনিক কৃষক হতে হলে কী কী দক্ষতা প্রয়োজন, তা কি আমরা জানি? আধুনিক কৃষক হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষিত না হলে কখন কোন ফসল চাষ

করলে বেশি লাভ হবে, কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল চাষ করা সম্ভব, কী কী সার ব্যবহার করলে ফসল ভালো হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। যারা শিক্ষিত নন, তারা বেশিরভাগ সময় সঠিক তথ্য সঠিক সময়ে জানতে পারেন না। শিক্ষিত না হলে, বীজ ও সার-এর প্যাকেটের গায়ে যে নিয়মাবলি লেখা থাকে তা পড়া সম্ভব হয় না। যথাযথভাবে সেগুলো জমিতে ব্যবহার করাও তাদের জন্য কঠিন। কোনো শিক্ষিত মানুষ যখন কৃষিকাজ করেন, তখন তিনি চাষ সংক্রান্ত সকল বিষয় খতিয়ে দেখেন; লাভ-ক্ষতি ও তার সামর্থ্য বুঝে চাষের কাজে হাত দেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের কৃষি শিক্ষা বিষয় অধ্যয়নের সময় আধুনিক কৃষিকাজ সম্পর্কিত অনেক কিছু জানা যায়; পড়াশোনা জানলে অন্যান্য বই পড়েও শেখা যায়। শিক্ষিত চাষি জৈব সার তৈরি করে চাষের খরচ অনেক কমিয়ে আনতে পারেন। একই সাথে পারেন সঠিক পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক ফলন। নিত্য-নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে কাজ যেমন সহজ হয়ে যায়, তেমনি দ্রুত অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায়। আধুনিক কৃষকগণ এ থেকে বিস্তর মুনাফা করতে পারেন। সবজি চাষ করে অনেকেই আজ আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে জীবনধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা কি তেমন কেউ হতে চাই?

পশুপাখি পালন : পশুপালন কৃষিকাজের মতোই পুরোনো একটি পেশা। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশুপালন খুবই লাভজনক। বাংলাদেশের জমি খুব উর্বর। এখানে জমি পতিত রাখলেও তাতে প্রচুর ঘাস জন্মায়। এছাড়াও অতি সহজেই এসব জমিতে পশুপাখির খাদ্য উৎপাদন করা যায়, যা বিশ্বের অনেক দেশেই সম্ভব নয়। বিশ্বের অনেক দেশের জলবায়ু খুবই ঠান্ডা–প্রায়ই বরফ পড়ে। সেসব দেশে পশুপাখি পালন করা খুবই কঠিন। অথচ বাংলাদেশে যেমন বরফও পড়ে না, তেমনি মরুভূমির মতো খুব গরমও নেই। নাতিশীতোষ্ণ এই জলবায়ু পশুপাখি পালনের জন্য অতি উত্তম। প্রয়োজন শুধু সচেতনভাবে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপাখি পালন করা। তোমরা চাইলে অনেকেই আধুনিকভাবে পশুপাখি পালন করতে পার। মাত্র সাড়ে চার থেকে পাঁচলাখ টাকা খরচ করে ১০টি উন্নতজাতের দুগ্ধবতী গাভি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালন করে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা অর্থাৎ বছরে একুশ থেকে বাইশ লক্ষ টাকা উপার্জন করা সম্ভব। খুব অবাক লাগছে তাই না? এসো হিসাব করে দেখি–

উন্নত জাতের একটি গাভি প্রতিদিন ১০-১৫ লিটার দুধ দেয়। মনে করো, তোমাদের গরু দৈনিক গড়ে ১২ লিটার দুধ দেয়। তোমার এমন ১০টি গরু রয়েছে। বর্তমান বাজারে প্রতিলিটার দুধের দাম ৫০ টাকা। তাহলে ১০টি গরুর দৈনিক দুধের পরিমাণ ১২০ লিটার। সুতরাং দৈনিক আয় হবে ৬,০০০ টাকা। এভাবে মাসে অর্থাৎ ৩০ দিনে আয় হবে ১,৮০,০০০ টাকা।

আবার এই গাভিগুলো নিয়মিত বাচ্চা প্রসব করবে। সেগুলো বিক্রি করেও অনেক টাকা পাওয়া সম্ভব। একই রকম লাভ করা যায় পাখি (যেমন–হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েল ইত্যাদি) লালন পালন করে। তবে সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লালনপালন করতে হবে; অন্যথায় এমন লাভ করা সম্ভব হবে না। আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে পালন করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হবে।

কাজ

তোমার গ্রামের/পরিচিত একজন শিক্ষিত কৃষক সম্পর্কে লেখো। তিনি কীভাবে চাষ করেন, কীভাবে ফসলের পরিচর্যা করেন, কীভাবে অধিক লাভে ফসল বিক্রয় করেন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো।

স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে চাকরি : বাংলাদেশে অনেক এনজিও রয়েছে যেগুলো স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সকল এনজিওতে চাকরি করলে একদিকে যেমন নিজের নিয়মিত উপার্জন হয়, তেমনি দেশের ও সমাজের মানুষের উন্নয়নের জন্যও ভূমিকা রাখা যায়। এ সকল উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পশুপালন, মাছ চাষ, শিশু ও নারী অধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিশুদের সুরক্ষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কাজ করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে হলে একদিকে যেমন ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হতে হয়, তেমনি পেশাগত যোগাযোগ ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

স্থানীয় কারখানায় চাকরি : প্রত্যেক এলাকায় বিশেষ ধরনের কিছু কলকারখানা থাকে। যেমন– চট্টগ্রামে জাহাজ ভাঙা শিল্প, নারায়ণগঞ্জে লঞ্চ তৈরি ইত্যাদি। আমরা এ সকল কারখানায় চাকরি করেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এ সকল কারখানায় বেতন কম। ভালো করে খোঁজ নিলে দেখবে, এ সকল কারখানায় শুধু অদক্ষ শ্রমিকদের বেতন কম। যারা ওই সকল কারখানার বিভিন্ন কাজে দক্ষ, তারা কিন্তু বেশ ভালো উপার্জন করে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কারখানার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম দক্ষতার প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং চাকরির আবেদন করার আগেই সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার অনেক ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহেও নানা রকম দক্ষতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। যথাযথ পরিকল্পনা করে আমাদের সামনে অগ্রসর হতে হবে। দক্ষ ও পরিশ্রমী হলেই অনেক ছোট পরিসরে ক্যারিয়ার শুরু করেও অনেক বড় হওয়া যায়, অনেক সুনাম অর্জন করা যায়।

স্থানীয় পরিসরে ব্যবসায় : পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকেই ব্যবসায় একটি সম্মানজনক পেশা। ব্যবসায় ছোট-বড় বিভিন্ন পরিসরে করা যায়, বিভিন্ন পণ্য নিয়ে ব্যবসায় করা যায়। আগ্রহ, দক্ষতা ও পুঁজির উপর নির্ভর করে নানা রকম ব্যবসায় করা সম্ভব। আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবসায়সমূহের মধ্যে রয়েছে কাঁচামালের ব্যবসায়, ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়, পোশাক ও কাপড়ের ব্যবসায়, ফলমূল ও শাক-সবজির ব্যবসায়, মাছের ব্যবসায়, মুদি পণ্যের ব্যবসায়, যানবাহন ও পরিবহনের ব্যবসায় ইত্যাদি। যে ব্যবসায়ই করা হোক না কেন, যদি তা সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে করা যায় তবে তাতে উন্নতি হবেই।

জাতীয় পর্যায়

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রকম চাকরির সুযোগ রয়েছে। সরকারি, বেসরকারি, বিদেশি, বহুজাতিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রচুর সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশে। সাথে সাথে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবসায় করার সুযোগ। এজন্য শিক্ষাজীবনের শুরুতেই লক্ষ্য স্থির করে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যারা নিজেদের পেশাগত কাজে খুবই দক্ষ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের ভালো সুযোগ-সুবিধাসহ চাকরি দেয়।

এসো, বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে কী ধরনের চাকরি ও ব্যবসায়ের সুযোগ আছে, তার কয়েকটি আমরা জেনে নিই।

জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দেশে চাকরি করার অনেক সুযোগ রয়েছে। যেমন– সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আবার রয়েছে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে চাকরি।

ক্যাডার সার্ভিস : বাংলাদেশে সরকারি চাকরির কথা বললে প্রথমেই যে চাকরিটির নাম আসে তা হলো ক্যাডার সার্ভিস। বাংলাদেশে ২৬টি ক্যাডার রয়েছে। এর প্রতিটিতে চাকরি করার সুযোগ কেবল বাংলাদেশের শিক্ষিত নাগরিকদের। বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর (ক্যাডারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী) অনূর্ধ্ব ৩২ বছর বয়সের নাগরিকদের মধ্য হতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করে চাকরির জন্য সুপারিশ করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ প্রদান করেন। ক্যাডার কর্মকর্তাগণ দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চাকরি করার পাশাপাশি অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই এটি আমাদের দেশের শিক্ষিত নাগরিকদের প্রথম পছন্দের পেশা। এ চাকরিগুলো পেতে হলে আমাদের শিক্ষাস্তরে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে হবে।

শিক্ষকতা : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ উপযোগী করে গড়ে তোলেন। দেশ-কাল জাতিভেদে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে। তাই শিক্ষকতার জ্ঞান বিতরণের এই মহান পেশায় তোমরা ক্যারিয়ার শুরু করতে পারো। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা বেছে নিলে একদিকে যেমন পাবে সম্মান-মর্যাদা, অন্যদিকে সুন্দর ও নিশ্চিত জীবন।

শিক্ষাস্তরের গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় প্রতিবছরই শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হতে চাইলে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে (সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী)। প্রধান শিক্ষক হতে চাইলে তাকে স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি বিএড ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষকতার ক্যারিয়ার শুরু করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রতিবছর নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। যদি শিক্ষাজীবনে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকে আর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকে, তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার ক্যারিয়ার শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা নিয়োগ পেয়ে থাকেন। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকতার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া ভিন্ন। সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করতে চাইলে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আর বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতার জন্য নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ দিয়ে থাকে। কলেজে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষকতার সর্বোচ্চ পর্যায় বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার। এজন্য শিক্ষার সকল পর্যায়ে ভালো ফলাফল থাকতে হবে।

আইনসংক্রান্ত পেশা : সম্মান এবং সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য বর্তমান সময়ে আইন পেশার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আইন পেশায় এখন নতুন নতুন মাত্রা ও সম্ভাবনা যোগ হয়েছে। মর্যাদাপূর্ণ এ পেশায় পূর্বে সাধারণত পুরুষরাই আসতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও এ পেশায় আসছেন। নিম্ন আদালতে বিচারক ও আইনজীবী হিসেবে কাজের সুযোগ তো আছেই, আছে সর্বোচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী কিংবা

বিচারপতি হওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়া নিম্ন ও উচ্চ আদালতে সরকার-নিয়োজিত আইনজীবী হিসেবেও পেশা গড়ার সুযোগের পাশাপাশি রয়েছে নোটারি আইনজীবী হওয়ার সুযোগ।

বিচার বিভাগ ছাড়াও নির্বাহী আদালতগুলোতে আইনজীবীরা মামলা পরিচালনা করার অধিকার রাখেন। এমনকি আইনজীবীরা আদালতে ও বাইরে বিভিন্ন চেম্বার ও ফার্মে ইন হাউস আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারেন। আইনজীবী হতে হলে আইনের উপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর বার কাউন্সিল থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন পেশায় নিয়োজিত হতে হয়। এ প্রক্রিয়া অবশ্য নিম্ন আদালতের জন্য। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত নিম্ন আদালতে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

কেউ যদি বিচারক হতে চান, সেক্ষেত্রে তাকে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আইনজীবী হিসেবে কারও যদি কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে তিনি পাবেন বিচারপতি হওয়ার সুযোগ। একজন আইনজীবীর রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার সুযোগ। যেমন– পারিবারিক, জমিজমা, ফৌজদারি, রিট, কোম্পানি, শ্রম আইন কিংবা আয়কর ইত্যাদি। এসব ছাড়াও বর্তমানে আইন পেশায় আরও নতুন কয়েকটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যেমন– বুদ্ধিবৃত্তিক ও মেধাস্বত্ব, ট্রেডমার্কস, পেটেন্ট ও ডিজাইনবিষয়ক আইনি কাজ। পরিবেশ আইন নিয়েও সারা দেশে কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে সাংবাদিকদের মামলা পরিচালনা, কাস্টমস ও ভ্যাট-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রও বাড়ছে। মানবাধিকারকর্মী হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থায় কাজের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক-বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো ইদানীং আইন কর্মকর্তা নিয়োগ দিচ্ছে। দেশে আইন সাংবাদিকতার সুযোগ বেড়েছে আগের তুলনায়।

ব্যাংক ও বিমা : ব্যাংক ও বিমা খাতেও রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষিত নাগরিকদের চাকরি করার সুযোগ। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক ও বিমা কোম্পানি রয়েছে। এ পেশাতেও নানা ধরনের সুযোগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি ছাড়াও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী হিসেবে চাকরি করার সুযোগও আছে।

পোশাকশিল্প : বাংলাদেশের পোশাকশিল্প বিশ্বখ্যাত। এদেশের তৈরি পোশাকের যেমন বিশ্বব্যাপী কদর আছে, তেমনি আছে পোশাক তৈরির বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতকারী শিল্পের। আমাদের দেশে আশির দশক থেকে রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে তৈরি পোশাকশিল্পের উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এ শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজারও দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। এ শিল্পের মাধ্যমে দক্ষ-অদক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এ শিল্পে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে সুযোগ-সুবিধা এবং বেতন উপযুক্ত হওয়ার কারণে অনেক শিক্ষিত তরুণ পোশাকশিল্পে তাদের ক্যারিয়ার শুরু করছেন। দেশের ক্রমবিকাশমান এ শিল্পে শুধু যে শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তা নয়; এবং দেশের পিছিয়ে পড়া অনেক বেকার যুবক-যুবতী তাদের শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

গার্মেন্টস শিল্পে মার্চেন্ডাইজার, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ফ্যাশন ডিজাইনার, প্রোডাকশন কর্মকর্তা, বাণিজ্যবিষয়ক কর্মকর্তা ইত্যাদি পদে চাকরি করার সুযোগ রয়েছে। এ পদগুলো ছাড়া আরও কিছু পদ রয়েছে সেখানেও কাজ করার প্রচুর সুযোগ আছে যেমন– ফিনিশিং ইনচার্জ, কাটিং মাস্টার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, ডাইং মেশিন অপারেটর, প্যাটার্ন মেকার ইত্যাদি। এসব পদে কাজ করে ক্যারিয়ারে সাফল্য অর্জন সম্ভব। পোশাকশিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই এ সেক্টরে সাফল্য অর্জন করা যায় না। গার্মেন্টস সেক্টরে যেহেতু অনেক ভাগ আছে তাই কোন বিষয়ে ক্যারিয়ার শুরু করবে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন।

নৌযান ও নৌপরিবহণ শিল্প : সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরির কারিগর হওয়ার সুযোগ এখন আমাদের দ্বারপ্রান্তে। কারণ জাহাজশিল্পকে ঘিরে দেশে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত তৈরি হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশেও আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ রপ্তানি করছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে বাজার বাড়ায় দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়ত দক্ষ জনবল খুঁজতে হচ্ছে। ফলে এ খাতে দিন দিন কাজের সুযোগ বাড়ছে। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী একজন নেভাল আর্কিটেক্ট জাহাজের নকশা প্রণয়ন করেন। পুরো জাহাজের নকশাকে আবার কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়। এরপর শিপ বিল্ডিং প্রকৌশলী ডিজাইন অনুযায়ী জাহাজের ওয়েলডিং, ফিটারিং, প্রিন্টিং ও গুণগত যন্ত্রাংশের ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেন। পুরো কাজটি করতে হয় নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। কারণ, গ্রাহকেরা জাহাজ নির্মাণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে গুণগতমান নিশ্চিত করে থাকেন। জাহাজশিল্পে শিপ বিল্ডিং প্রকৌশলীর পাশাপাশি সহকারী প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করার সুযোগ আছে। বিদেশেও ভালো বেতনে এ পেশার ব্যাপক চাহিদা ও কাজের সুযোগ আছে। বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকারিভাবে পরিচালিত নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি ও দুই বছর মেয়াদি শিপ বিল্ডিং, শিপ ফেব্রিকেশন ও শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স চালু রয়েছে।

অটোমোবাইল শিল্প : মানুষের চলাচলের অন্যতম বাহন হচ্ছে গাড়ি। বিগত বছরগুলোতে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরে গাড়ির ব্যবহার বহুলাংশে বেড়েছে। আগের তুলনায় বর্তমানে দেশে অনেক বেশি গাড়ি আমদানি করা হচ্ছে। তোমরা জেনে আনন্দিত হবে যে, বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক বাস, ট্রাক, অটোরিকশার শুধু চেসিস আমদানি করে, এগুলো তৈরির কাজ এখানে সম্পন্ন হচ্ছে। আমদানিকৃত এসব গাড়ি পরবর্তী সময়ে সার্ভিসিং বা মেরামতের জন্যই অটোমোবাইল কারিগরি শিল্পের বিকাশ লাভ করছে দ্রুতগতিতে। আর এ শিল্পের নানা ধরনের কাজে দক্ষ অটোমোবাইল প্রকৌশলী প্রয়োজন। তাই অটোমোবাইল শিল্পে যারা আগ্রহী তাদের দৃষ্টি এখন এদিকেই। অটোমোবাইল শিল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে নতুন গাড়ি তৈরি এবং তা বিক্রয় ও পরবর্তী সার্ভিসিং এবং মেরামতসহ যাবতীয় কারিগরি কাজ। সাধারণত এই শিল্পে কাজের ধরন বিবেচনায় তিনটি ভাগ রয়েছে। এগুলো হলো : উৎপাদন, সেলস এবং সার্ভিসিং। উৎপাদন ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রকৌশলীরা তাদের দক্ষতা দেখানোর ব্যাপক সুযোগ পান। সেলস বিভাগে গাড়ি বিপণন, বিক্রয় ও বিতরণের কাজ করা হয়ে থাকে। গ্রাহকের কাছে গাড়ি সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রদান ও ইঞ্জিন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা এই বিভাগের মূল দায়িত্ব। বিক্রয়-পরবর্তী সার্ভিসিং বলতে ওয়ারেন্টিযুক্ত বা সার্ভিস ফি দিয়ে গাড়ি মেরামত ও সার্ভিসিং করাই হলো সার্ভিসিং বিভাগের প্রধান কাজ।

এই শিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

সম্ভাবনাময় পেশা : ফ্রিল্যান্সিং

ফ্রিল্যান্সিং শব্দের মূল অর্থ হলো মুক্ত পেশা। অর্থাৎ মুক্তভাবে কাজ করে আয় করার পেশা। আরেকটু সহজভাবে বললে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়ে নেয়। নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে এসব কাজ করানোকে আউটসোর্সিং বলে। যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে দেন, তাদের ফ্রিল্যান্সার বলে। আউটসোর্সিং সাইট বা অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা থাকে। যেমন– ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, নেটওয়ার্কিং ও তথ্যব্যবস্থা (ইনফরমেশন সিস্টেম), লেখা ও অনুবাদ, প্রশাসনিক সহায়তা, ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া, গ্রাহকসেবা, বিক্রয় ও বিপণন, ব্যবসায় সেবা ইত্যাদি। কাজগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে করে দিতে পারলেই অনলাইনে আয় করা সম্ভব। দক্ষতা থাকলেই কেবল ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসেবে নেওয়া সম্ভব। তাই ফ্রিল্যান্সিংকে পেশা হিসেবে নির্ধারণ করার পূর্বে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।

ফ্রিল্যান্সিং যেহেতু মুক্ত পেশা, সেখানে ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার চেয়ে কাজের জবাবদিহিতা বেশি। কাজ যদি সঠিক না হয় এবং কাজে যদি স্বচ্ছতা না থাকে তাহলে এই সেক্টরে সফল হওয়া যায় না। ফ্রিল্যান্সিং-এর কাজ পাওয়া যায় এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য এমন কয়েকটি সাইটের ঠিকানা দেওয়া হলো : www.upwork.com, www.freelancer.com, www.elance.com, www.getacoder.com, www.guru.com, www.vworker.com, www.scriptlance.com ইত্যাদি।

উন্নয়ন প্রকল্প : বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শেষ করার জন্য প্রতিবছরই বিভিন্ন খাতে নানা ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। প্রকল্পগুলোতে প্রকল্প মেয়াদের জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকল্পের চাকরি স্বল্প মেয়াদের হলেও এখানে দক্ষতা অর্জন করলে ভবিষ্যতে অন্য চাকরি বা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। প্রকল্পেও কর্মকর্তা ও কর্মচারী উভয় ধরনের চাকরির সুযোগ রয়েছে।

সামরিক ও নিরাপত্তা সংস্থা :

সরকারি পর্যায়ে সামরিক ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন চাকরির সুযোগ। সুস্থ, শারীরিক সামর্থ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীতে চাকরিতে যোগ দেওয়া যায়। সামরিক বাহিনীর চাকরির মাধ্যমে যেমন দেশের সেবা করা যায়, তেমনি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করে বিশ্বশান্তিতেও ভূমিকা রাখা যায়। তাই এটিও অনেকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় চাকরি। এছাড়াও পুলিশ, আনসার, বর্ডারগার্ড বাহিনীতেও প্রতিবছর প্রচুর জনবল নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে অনেক বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা গড়ে উঠেছে। এ সংস্থাগুলোতেও চাকরির সুযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য পেশা আমরা গ্রহণ করতে পারি। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রতি বছর অনেক চাকরির বাজার সৃষ্টি করে। প্রকৌশল ও চিকিৎসা খাত বাংলাদেশে দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। প্রসারিত হচ্ছে কৃষি প্রকৌশল ও গবেষণা খাতসমূহ। দেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আরও অসংখ্য চাকরির সুযোগ। অনেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রচুর দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন।

> **অ্যাসাইনমেন্ট :** তোমার জানা পেশাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। এবার সে সকল পেশা গ্রহণ করতে হলে কোথায় কোন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয়, কোথায় কোথায় কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে ইত্যাদি তথ্য নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করো।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের সুযোগ

আমাদের অনেকেরই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ না কেউ আছেন যিনি দেশের বাইরে চাকরি করেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিরা দেশে পরিবারের জন্য অর্থ পাঠান। এতে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা বিশেষ করে ডলারের রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়, যা আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিদেশে চাকরির মাধ্যমে শুধু নিজের পরিবারের স্বচ্ছলতা আসে তা নয়, এতে দেশের অর্থনীতিও অনেক সমৃদ্ধ হয়। আমরা একটু চিন্তা করলেই অনেকগুলো দেশের নাম মনে করতে পারি যেখানে অনেক বাংলাদেশি কায়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধাশ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

দেশের বাইরে রয়েছে কাজের অনেক সুযোগ। বিদেশে কর্মরত বহু বাংলাদেশি প্রতি বছর বিশাল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশে পাঠান। এর মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনীতি সচল থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা নানা ধরনের পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে অনেক বেশি বাংলাদেশি কাজ করছেন মধ্যপ্রাচ্যে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে বহু সংখ্যক বাংলাদেশি কাজ করছেন শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী কিংবা শ্রমিক হিসেবে। কোনো কাজকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। যিনি কায়িক শ্রম করেন তাকে আমরা শ্রমিক বলি। তার সম্মান কোনোভাবেই একজন শিক্ষক, চিকিৎসক বা প্রকৌশলীর চেয়ে কম নয়। কেননা কেউ না কেউ এই কায়িক শ্রম না করলে আজ আমাদের সভ্যতা, সমাজ, রাষ্ট্র গড়ে উঠত না। তাই আমাদের যেকোনো পেশার মানুষকে সম্মান দেওয়া উচিত।

এশিয়া

চীন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনামসহ এশিয়ার অনেক দেশে প্রযুক্তিবিদ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতকগণ সরাসরি চাকরি নিয়ে যেতে পারেন। মালয়েশিয়াতে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেও উচ্চবেতনে কাজ পাওয়া সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করে মালয়েশিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে চাকরি লাভের সুযোগ রয়েছে। বহু বাংলাদেশি সেখানে শিক্ষক হিসেবে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। বহুজাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে পদোন্নতি নিয়ে এশিয়ার এ দেশগুলোতে উচ্চবেতনে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে ব্যবসায় প্রশাসন ও প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের জন্য। যে কাজ করতে যাওয়া হবে সে কাজে অবশ্যই দক্ষতা থাকতে হবে। অন্যথায় বিদেশের মাটিতে অনেক সমস্যা হতে পারে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠান ভুয়া চাকরি দেখিয়ে বিদেশে লোক পাঠাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোর সাথে যোগাযোগ করলে উপকৃত হওয়া যাবে।

১০১৮

দলগত কাজ

শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেকে তার পাশের জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎকারের বিষয় হবে "তুমি কোন বিষয়ে ভবিষ্যতে পড়াশুনা করতে চাও বা প্রশিক্ষণ নিতে চাও? পড়ালেখা শেষ করে বা প্রশিক্ষণ লাভ করে কোন দেশে কাজের জন্য যাওয়া সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করো?" সবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে সবাই সবার সাক্ষাৎকার শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনা করবে। শিক্ষক সহায়তা করবেন।

আরব দেশসমূহ

বিদেশে কাজের সবচেয়ে বেশি সুযোগ রয়েছে আরব দেশ তথা সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহারাইন প্রভৃতি দেশে। এ সকল দেশে বিভিন্ন কলকারখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণে, ব্যবসায়-বাণিজ্য এমনকি সরকারি কাজে বিদেশ থেকে প্রচুর কর্মী প্রতি বছর নেওয়া হয়ে থাকে। আর তাদের মাঝে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো বাংলাদেশি। সুউচ্চ ভবন, সড়ক ও সেতু নির্মাণ থেকে শুরু করে সরকারি প্রতিষ্ঠান তথা হাসপাতাল, বিমান-বন্দর, বিদ্যালয়, অফিস-আদালত ও শিল্প কারখানায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। যে সকল বাংলাদেশি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত তারা উচ্চবেতনে রেফ্রিজারেশন, ওয়েল্ডিং, গ্লাস ও সিরামিক কারখানা, বিমান রক্ষণাবেক্ষণ, পোশাক তৈরি, অটোমোবাইল তৈরি, মেশিন চালনা, কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়ি চালনাসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন। এ সকল কাজে দক্ষ ও ভাষাজ্ঞান জানা কর্মীর চাহিদা বেশি।

আরব দেশে অন্যতম চাহিদা রয়েছে খনি শ্রমিকের। কেননা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক জ্বালানি পাওয়া যায় এ অঞ্চলের ভূ-অভ্যন্তরে। তাই তেল-গ্যাস উত্তোলন কাজে কারিগরি দক্ষতা থাকলে আরবদেশের যে কোনো দেশে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সব সময় চেষ্টা করে দেশ থেকে দক্ষ শ্রমিকদের আরবদেশে কাজে পাঠানোর। সরকারের জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরো প্রত্যক্ষভাবে এ সেক্টরে কাজ করে। আর সরকার অনুমোদিত বেসরকারি কিছু এজেন্সি আরব দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরি সংগ্রহ করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিদেশে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। সেজন্য তারা নির্দিষ্ট হারে ফি গ্রহণ করে। তবে পুরো প্রক্রিয়া বাংলাদেশ সরকার তত্ত্বাবধান করে থাকে। জাতীয় দৈনিক, বিভিন্ন বৈদেশিক কর্মসংস্থান কাজে নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং অনলাইন চাকরির ওয়েবসাইটে বিদেশে চাকরির বিজ্ঞাপন প্রায়ই প্রকাশ করা হয়। এছাড়া জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরো এবং বেসরকারিভাবে বিদেশে জনশক্তি পাঠানোর প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বায়রার অফিসে চাকরির খবর সরাসরি গিয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব।

আরব দেশে পেশাজীবী তথা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষকগণের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলো মূলত বিদেশি পেশাজীবীদের দিয়েই তাদের কাজ চালিয়ে থাকে। সে কারণে প্রতি বছর সম্মানজনক আয়ের আশায় বহু বাংলাদেশি চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি আরবদেশে যান। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা শেষ করে এ সকল দেশের দূতাবাসে যোগাযোগ করলে চাকরির সন্ধান পাওয়া যায়। আরব দেশের দেশগুলোর বিভিন্ন কোম্পানির ওয়েবসাইটে বিদেশি পেশাজীবী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি থাকে। অনলাইনে সার্চ করে তা পাওয়া সম্ভব।

কাজ

মধ্যপ্রাচ্যে কোন ধরনের কাজ তোমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়? এ কাজ করতে গেলে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পার এবং কীভাবে তা সমাধান করবে?

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কম্পিউটার প্রকৌশলী চাকরি নিয়ে যান। এক্ষেত্রে পাশের দেশ ভারত অনেক এগিয়ে। তবে দিন দিন বাংলাদেশি তরুণ কম্পিউটার প্রকৌশলীগণ তাদের মেধার স্বাক্ষর রেখে যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি চাকরি নিয়ে যাচ্ছেন। কম্পিউটার প্রকৌশলীদের পাশাপাশি চিকিৎসকগণ যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেল লাইসেন্স পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার্থে যাওয়া বহু বাংলাদেশি শিক্ষার্থী চাকরি নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। ব্রিটেন, সাইপ্রাস, ইতালি, ফ্রান্স ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশে রাঁধুনি অর্থাৎ শেফদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দক্ষতা অর্জন করে ইউরোপের এসব দেশে অনেক অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। তোমাদের মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষার্থে এসব দেশে যেতে চাও। এসব দেশে কাজ করে অনেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড

ব্যবসায় শিক্ষা শাখার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অস্ট্রেলিয়াতে বিশেষ চাহিদা রয়েছে। তাই হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা স্কিল মাইগ্রেশনের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণ করছেন। আইটি বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন এমন বাংলাদেশিদের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় কাজের জন্য আবেদন করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে রন্ধনশিল্পীদের উচ্চবেতনে

কাজ করার সুযোগ রয়েছে। দক্ষ শেফরা বড় বড় হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেন।

একক কাজ

বিদেশে চাকরি করতে হলে তুমি কোন দেশকে বেছে নেবে? সে দেশে কাজ নিয়ে যেতে হলে কোন বিষয়ে পড়াশোনা করা প্রয়োজন? সে দেশে বাংলাদেশিদের জন্য আর কী কী কাজের সুযোগ রয়েছে?

আত্মকর্মসংস্থান

আত্মকর্মসংস্থান বলতে আমরা কী বুঝি? নিজের কর্মসংস্থান বা কাজের সুযোগ নিজেই সৃষ্টি করা? ব্যবসায় করা? হ্যাঁ, দুটোই ঠিক। আমাদের মাঝে অনেকেই রয়েছেন যারা অন্যের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চান না। আবার অনেকে অনেক চেষ্টা করেও চাকরি জোগাড় করতে পারছেন না। কিংবা এমনও হয় যে যোগ্যতা অনুসারে চাকরি দুর্লভ হয়ে পড়ছে। অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত আয়ের অভাবে পরিবার ও নিজের ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয় না। নিজের আয়ের ব্যবস্থা নিজে করতে পারার নামই আত্মকর্মসংস্থান। শুধু তাই নয়, নিজের কাজের সুযোগ নিজে সৃষ্টি করলে আত্মতৃপ্তি লাভের পাশাপাশি অন্য লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। আত্মকর্মসংস্থান গ্রাম এবং শহরের প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে।

গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে কৃষি, খামার এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে যে-কেউ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব। যেমন–

১. নিজস্ব জমি বা জমি ইজারা নিয়ে ফসল, ফলমূল এবং সবজির চাষ;

২. হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের খামার তৈরি;

৩. নিজেদের পুকুরে বা স্থানীয় জলাধার ইজারা নিয়ে মাছ চাষ;

৪. তৈরি পোশাক, পোশাকের নকশা তৈরি, স্ক্রিন প্রিন্ট, বুটিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র পোশাক শিল্প স্থাপন;

৫. মৃৎশিল্প, তৈজসপত্র তৈরি, হস্তশিল্পের মতো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন;

৬. প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান দেওয়া ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আরও অনেক তথ্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) সাথে যোগাযোগ করলে পাওয়া সম্ভব।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের কয়েকটি ক্ষেত্র

ফসল চাষ : আত্মকর্মসংস্থানমূলক এ সকল কাজে সরকারি সুবিধা পাওয়া যায়। ফসল, মৌসুমি সবজি কিংবা ফলের চাষ করতে হলে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সেখানে বিনামূল্যে কৃষি বিষয়ক তথ্য, চাষ পদ্ধতি, অধিক ফলন পদ্ধতি, সার ও কীটনাশক ব্যবহারের নিয়ম–এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কৃষি ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়েও ফসল ও সবজি চাষ শুরু করা যায়।

গবাদি পশু পালন : গবাদি পশুর খামার দেওয়ার মাধ্যমে মাংস ও দুধের ব্যবসায় করা যায়। একই সাথে পশু বিক্রির মাধ্যমে ভালো আয় করা সম্ভব। অনেক পশু খামারি কোরবানির সময় নিয়মিত পশু সরবরাহ করে থাকেন। এতে ভালো আয় হয়। স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে পশুপালন সম্পর্কে সকল সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

মৎস্য চাষ : মৎস্য চাষ করে বহু তরুণ আত্মনির্ভর হয়েছেন। সচ্ছল জীবনযাপন করছেন। মাছ হলো আমাদের আমিষের প্রধান উৎস। আমাদের দেশে প্রচুর নদীনালা, খালবিল রয়েছে। মৎস্য চাষ করতে হলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে স্থানীয় মৎস্য অফিস। কোথা থেকে মাছের পোনা সংগ্রহ করতে হয়, মাছকে কী খাবার দিতে হয় এসব বিষয়ে তারা তথ্য প্রদান করে। মৎস্য চাষের পাশাপাশি হ্যাচারি বা পোনা উৎপাদন ব্যবসায়ও করা যায়। সেক্ষেত্রে পোনা উৎপাদন করে অন্য মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা যায়।

ক্ষুদ্র ও কুটির এবং পোশাক শিল্প : বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের স্থানীয় অফিসে যোগাযোগ করে পোশাক তৈরি, নকশা করা, হস্ত ও মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের বাসার কোনো কক্ষ ব্যবহার করা যায়, আলাদা জায়গা ভাড়া নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। পরে ব্যবসায় বড় হলে আলাদা জায়গা নেওয়া যেতে পারে। যেকোনো ধরনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে। নারীদের জন্য সেলাই ও পোশাকের নকশার উপর বহু উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় : নিজে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসায় করতে চাইলে স্থানীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনকারী বা বড় বড় কোম্পানির ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করে পণ্য সংগ্রহ করে দোকান সাজানো যেতে পারে। এমন স্থান দোকান দেওয়ার জন্য বেছে নিতে হবে যেখানে জনসমাগম হয়, মানুষের যাতায়াতের পথে পড়ে এবং সেখানে পৌঁছানো সহজ। ডিলারদের থেকে পণ্য না নিয়ে সরাসরি উৎপাদকদের থেকে পণ্য নিতে পারলে কম দামে তা কেনা সম্ভব।

শ্রেণির কাজ

গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে হলে তুমি উপরের কোন কাজকে বেছে নেবে? কীভাবে নিজের ব্যবসায় দাঁড় করাবে এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করো।

বুটিক শপ : আত্মকর্মসংস্থানে একটি উদাহরণ হলো বুটিক শপ। বর্তমানে শহরগুলোতে বুটিক শপের চাহিদা ব্যাপক। নিত্য-নতুন ডিজাইনের পোশাক সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং সৃজনশীল ডিজাইনের পোশাক বিক্রি করতে পারলে এ ব্যবসায় অনেক লাভ হয়। এ ব্যবসায় প্রধান ক্রেতা হলেন নারী। সেজন্য নারীবান্ধব পরিবেশ প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করতে হবে। ছেলেদের টি-শার্ট, ফতুয়া, পাঞ্জাবির ব্যবসায়ও অত্যন্ত লাভজনক।

খাবারের দোকান : বর্তমানে অনেকেই ব্যবসায়ের জন্য খাবারের দোকান দিতে পারে। খাবার হতে হবে স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিছন্ন পরিবেশে তৈরি। সুস্বাদু খাবার ক্রেতার সাধ্যের মধ্যে দাম রেখে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। কারণ, খাবার মানুষের প্রধান চাহিদা। তবে খাবারের দোকান দিতে হলে দোকানের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তৈরি শেখার জন্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নেওয়া যেতে পারে।

ফোন-ফ্যাক্স-প্রিন্টের দোকান : বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার পাশাপাশি এ ব্যবসায় করে থাকেন। অনেকে মুল পেশা হিসেবেই এ ধরনের দোকান দিয়ে থাকেন। স্বল্প বিনিয়োগে এ ব্যবসায়ে আত্মনির্ভর হওয়ার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপকার করা সম্ভব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে এ ধরনের দোকান অধিক উপযোগী। এছাড়া অফিসপাড়াতেও এর চাহিদা

২০২৪

রয়েছে। বর্তমানে ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে মোবাইলে রিচার্জ ছাড়াও মোবাইল ব্যাংকিং-এর সুযোগও রয়েছে। তাই একই ছাদের নিচে বহু ধরনের ব্যবসায় করা সম্ভব।

সকল ব্যবসায়ের জন্য ট্রেড লাইসেন্স আবশ্যক। গ্রাম হলে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌর শহর হলে পৌরসভা এবং সিটি হলে সিটি করপোরেশন থেকে এ লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। ব্যবসায় থেকে আয়ের উপর ঠিকমতো কর প্রদান করা সকল নাগরিকের কর্তব্য।

চাকরির খোঁজে

শিক্ষাজীবনের একেকটি স্তর শেষ করে আমরা একেকজন একেক দিকে চলে যাই। অনেকেই উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে ভালো চাকরির স্বপ্ন দেখি। মনের মতো কাজ পেতে প্রয়োজন এ বিষয়ে একাগ্রতা। ভালো কাজ পেতে হলে সর্বদা চোখ-কান খোলা রাখা চাই। চাকরির বিজ্ঞপ্তির খবর পাওয়ার প্রধান মাধ্যমগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন;

২. চাকরির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন এবং

৩. ব্যক্তিগত খোঁজ।

দৈনিক পত্রিকাগুলোর ভেতরের পাতাগুলোতে চাকরির প্রচুর বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। সেখানে কীভাবে আবেদন করতে হবে, কোন ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে তা বিস্তারিত দেওয়া থাকে। আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্র অফিসের ঠিকানায় না পাঠিয়ে ই-মেইলে পাঠাতে বলে। অনেক প্রতিষ্ঠান আবার তাদের ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে আবেদন করতে বলে। তবে সরকারি-বেসরকারি বহু প্রতিষ্ঠানে আবেদন ফরম কিনেও আবেদন করতে হয়। সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন বিজ্ঞাপনে বলা থাকে। জাতীয় দৈনিকের পাশাপাশি চাকরির জন্য আলাদা পত্রিকাও রয়েছে। সেগুলোতে খুঁজলে অনেক চাকরির সন্ধান পাওয়া সম্ভব। প্রযুক্তিনির্ভর একবিংশ শতাব্দীতে চাকরি খোঁজার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। চাকরির বিজ্ঞাপন সমৃদ্ধ আলাদা ওয়েবসাইট রয়েছে বেশ কয়েকটি। এর মাঝে প্রথম সারির ওয়েবসাইটগুলোতে চাকরির প্রচুর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া থাকে। কী যোগ্যতা প্রয়োজন, আবেদনের শেষ তারিখ কবে, চাকরি পাওয়ার পর কী কী সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে তা বিস্তারিত বলাও থাকে। ফলে অনলাইনে পছন্দমতো চাকরির জন্য আবেদন করা যায়।

শুধু বিজ্ঞপ্তি দেখেই নয় বরং পরিচিত অনেকের কাছ থেকেও অনেক চাকরির সন্ধান পাওয়া যায়। সব পত্রিকার সব বিজ্ঞপ্তি জানা সম্ভব নয়। সেজন্য সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। যাতে তারা চাকরির বিষয়ে সন্ধান পেলে তোমাদের তা সময়মতো জানাতে পারেন। এজন্য সকলের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা।

দলগত কাজ

শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী ছোট ছোট দলে একজন চাকরিপ্রার্থীর কী কী যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করো। কাজ শেষে প্রতিটি দল তাদের ধারণা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। শিক্ষক পুরো প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করবেন।

অ্যাসাইনমেন্ট

১। কোনো একটি দৈনিক পত্রিকার বিগত এক সপ্তাহের সকল সংখ্যা খুঁজে তোমার পছন্দমতো ১০টি চাকরির বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহ করো এবং শ্রেণিকক্ষে এনে শিক্ষক ও সহপাঠীদের দেখাও।

২। অনলাইনে খোঁজ করে চাকরির সন্ধান দেয় এমন ৩টি ওয়েবসাইটের ঠিকানা বের করে শ্রেণিকক্ষে সবাইকে দেখাও।

কেস স্টাডি

খুলনার ছেলে সোহেল আহমেদ ডিগ্রি পাস করে অনেক দিন ধরে চাকরি খুঁজছেন; কিন্তু পাননি। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নেন নিজেই কিছু করবেন। বাসা থেকে কিছু টাকা নিয়ে তার কলেজের পাশেই তিনি ফটোকপি, কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট ও মোবাইলে টাকা রিচার্জ করার একটি দোকান দেন। প্রথমে অল্প দামে একটি ফটোকপি মেশিন কিনলেও আস্তে আস্তে ব্যবসায় লাভ বাড়তে থাকলে তিনি একদিন নতুন মেশিন বসান। অত্যন্ত সদালাপী ও সৎ হওয়ায় সোহেলকে সবাই খুব পছন্দ করে। তার দোকানে নির্দ্বিধায় সবাই কাজ করাতে আসে। পরিচিত ও নিয়মিত গ্রাহকদের সোহেল আহমেদ মাঝে মাঝে মূল্য ছাড় দেন। এভাবে তার ব্যবসায় দিন দিন বাড়তে থাকে। এখন খুলনা শহরে তিনটি দোকান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। মোট ৬ জন কর্মচারী তার দোকানগুলোতে কাজ করেন। তিনি তার ছোট ভাইদেরও এ ব্যবসায় আসার পরামর্শ দেন।

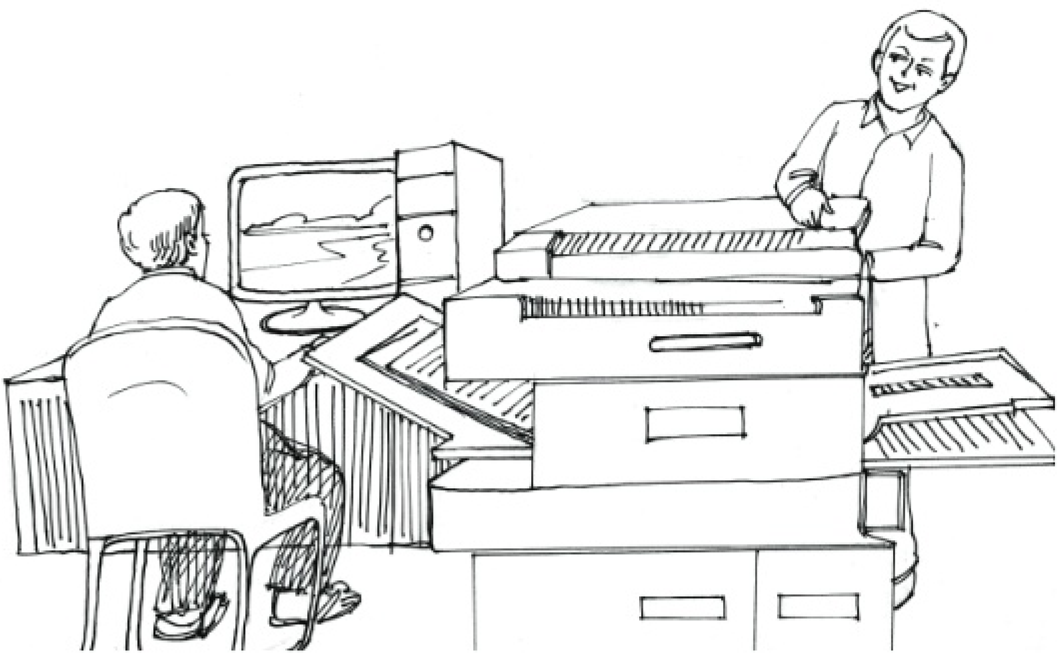

উপরের গল্পে আমরা দেখছি সোহেল আহমেদ কীভাবে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে তিনি নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার দোকানে অন্যরা কাজের সুযোগও পেয়েছেন। এভাবে আমরা যদি নিজেদের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারি, তাহলে অবিলম্বে আমাদের দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বেকার সমস্যা দূর হবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন আরও উপায় তোমরা নিজেরাই বের করতে পারবে। চাই শুধু সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন।

কাজ

শহরের একজন বাসিন্দা হিসেবে যদি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাও তাহলে তুমি কোন ব্যবসায়কে বেছে নেবে? কীভাবে নিজের প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাবে? তার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করো।

চাকরি চাই : জীবনবৃত্তান্ত লেখা

সকল চাকরির জন্য জীবনবৃত্তান্ত আবশ্যক। চাকরির আবেদন করতে হলে অবশ্যই চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানে জীবনবৃত্তান্ত পাঠাতে হয়। ইংরেজিতে একে বলে কারিকুলাম ভিটাই (সিভি)। বহু জীবনবৃত্তান্তের ভিড়ে উপযুক্ত জীবনবৃত্তান্তই বেছে নেয় প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ। সেজন্য জীবনবৃত্তান্ত হতে হয় ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব। অনলাইনের এ যুগে ইন্টারনেটে সার্চ করলে হরেক রকম জীবনবৃত্তান্তের নমুনা বা ফরম্যাট খুঁজে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ কোনো চাকরিজীবী তার জীবনে কী ধরনের জীবনবৃত্তান্তের ফরম্যাট ব্যবহার করেছেন তা সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়। কেননা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্তে অনেক দিক থাকে যেগুলো সহজে আমাদের চিন্তায় নাও আসতে পারে। মনে রাখতে হবে, চাকরিদাতা প্রার্থীকে প্রথম পছন্দ করেন জীবনবৃত্তান্ত দেখে। নিয়োগদানকারী নিয়োগপ্রার্থীকে সাক্ষাৎকারে ডাকবেন কি ডাকবেন না তা অনেকটা নির্ভর করে জীবনবৃত্তান্তের উপর।

জীবনবৃত্তান্ত মূলত দুই প্রকার:

১. একাডেমিক জীবনবৃত্তান্ত এবং

২. প্রফেশনাল বা পেশাদার জীবনবৃত্তান্ত।

একাডেমিক জীবনবৃত্তান্ত সাধারণত দেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদনের জন্য প্রয়োজন হয়। আর প্রফেশনাল বা পেশাদার জীবনবৃত্তান্ত প্রয়োজন হয় চাকরির আবেদনের সময়ে। এখানে আমরা প্রফেশনাল জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করব।

একটি জীবনবৃত্তান্তে যে মৌলিক বিষয়গুলো থাকে তা হলো–

১। ছবি, নাম, যোগাযোগের ঠিকানা;

২। মা-বাবার নাম, পরিচয়, পেশা;

৩। একাডেমিক ডিগ্রি, রেজাল্ট, প্রতিষ্ঠানের নাম, পাসের সাল, প্রফেশনাল কোর্সের বৃত্তান্ত (যদি থাকে);

৪। সহশিক্ষাক্রমিক কাজ ও অর্জনের বিবরণ;

৫। অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে) এবং

৬। দুজন প্রত্যয়নকারীর নাম, পরিচয় এবং যোগাযোগের ঠিকানা।

জীবনবৃত্তান্ত বেশি বড় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা প্রতিষ্ঠানগুলো চাকরির জন্য অনেক জীবনবৃত্তান্ত পেয়ে থাকে। জীবনবৃত্তান্ত বেশি বড় হলে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ তা পড়ার সময় পায় না। অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সিভি পাঠানো যায় কিংবা অনেক প্রতিষ্ঠান ই-মেইলে সিভি পাঠানোর কথা উল্লেখ করে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিজ্ঞপ্তি না থাকলেও জীবনবৃত্তান্ত তাদের ওয়েবসাইটে পাঠিয়ে রাখা যায়, যেন পদ শূন্য হলেই তারা জীবন বৃত্তান্ত থেকে পছন্দের প্রার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

আদর্শ জীবনবৃত্তান্তের বৈশিষ্ট্য

১। সকল তথ্য স্পষ্ট করে দেওয়া থাকবে;

২। কোনো প্রকার বানান ভুল থাকবে না;

৩। কোনো বিষয় নিয়ে সংশয় থাকবে না;

৪। যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে;

৫। অল্প কথায় শিক্ষাগত জীবনের সব অর্জনের কথা বলা থাকবে;

৬। অর্জিত দক্ষতাগুলোর কথা উল্লেখ থাকবে এবং

৭। ভাষার ব্যবহার হবে সাবলীল।

কাজ

নিজের একটি জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করো।

কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সাথে সুসম্পর্ক

সকলের সাথে সকলের ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার অংশ। ভালো আচরণ করে সবার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। সকলের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে বিপদে-আপদে সবার সহায়তা লাভ করা যায়। বিপদে পড়লে আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এগিয়ে আসেন। কেননা, স্বাভাবিকভাবেই তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক থাকে। ঠিক একইভাবে কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে অবশ্যই সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। সুসম্পর্কের ফলে অনেক সময় অনেক ভালো চাকরির সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি চাকরিরত অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

ধরা যাক, তুমি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করো। কোনো এক সময় ফোন এলো তোমাকে এখনই বাসায় যেতে হবে। এদিকে অফিসে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করছ তুমি। আজকের মধ্যেই তা শেষ করতে হবে, নইলে অফিস বড় সমস্যায় পড়বে। তোমার বাসায় যাওয়াও জরুরি। কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চাইলে তারা এমন বলতে পারেন যে কাজটি যদি তোমার কোনো সহকর্মী করে দেন তবেই তুমি ছুটি নিয়ে বাসায় যেতে পারবে। এখন তোমার সাথে যদি সহকর্মীদের ভালো সম্পর্ক থাকে তাহলে অবশ্যই তারা তোমার জন্য এগিয়ে আসবেন। তোমার কাজটি ঐদিনের জন্য তারা সবাই মিলে করে দেবেন। তুমিও নিশ্চিত মনে বাসায় যেতে পারবে। এসব কারণে সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুব জরুরি। সহকর্মী বলতে উর্ধ্বতন, অধস্তন সবাইকেই বোঝানো হচ্ছে। সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক ভালো না হলে বেশি দিন কোথাও কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ সব অফিসই একটি দলগত কাজের জায়গা। সেখানে একা একা অনেক কিছু করে ফেলা সম্ভব নয়। সকলের সহায়তা নিয়েই একত্রে কাজ করে সামষ্টিক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এতে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় প্রকার সাফল্য অর্জন সম্ভব।

ক্রিকেট খেলায় যে দল জয়ী হয় সে দলের ক্যাপ্টেন প্রায়ই বলে থাকেন, এটি একটি দলগত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় জয় অর্জিত হয়েছে। পরস্পর সম্পর্কহীন ১১ জন দক্ষ খেলোয়াড়ের একটি দলের চেয়ে পরস্পর সুসম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ সাধারণ মানের ১১ জন খেলোয়াড়ের একটি দল অনেক শক্তিশালী। একইভাবে, কর্মীদের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক ভালো হলে অনেক জটিল কাজও সহজ হয়ে যায়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে সহকর্মীদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় পরপর দূরে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের অফিসের কাজের বাইরে দলগত কাজ দেওয়া হয়। হতে পারে সেটা কোনো খেলা। একসাথে কাজ করতে বা খেলতে গিয়ে তাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়। অফিসে ফিরে দৈনন্দিন কাজে এর প্রভাব পড়ে। আধুনিক ব্যবসায় প্রশাসনে সহকর্মীদের পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে যা যা করা প্রয়োজন:

১। দেখা হলে কুশল বিনিময় করা;

২। কোনো সহকর্মী কাজ করতে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লে নিজ থেকে তাকে সাহায্য করতে চাওয়া;

৩। মাঝে মাঝে সহকর্মীদের সাথে চা খেতে খেতে কাজের বাইরের আলাপ করা;

৪। ব্যক্তিগত ও স্পর্শকাতর বিষয়ে আলাপ এড়িয়ে যাওয়া;

৫। এক সহকর্মীর বিষয়ে অন্য সহকর্মীর কাছে সমালোচনা না করা;

৬। কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে অভিজ্ঞ সহকর্মীদের কাছে বিনীতভাবে সাহায্যের অনুরোধ জানানো;

৭। সহকর্মীদের কেউ রেগে গেলে নিজে না রেগে তাকে শান্ত করা;

৮। পেশাগত বা ব্যক্তিগত যেকোনো বিপদে এগিয়ে আসা এবং

৯। অবশ্যই সবার সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করা।

সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক থাকার উপকারিতা

১। সর্বদা তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়;

২। কঠিন কাজের চাপে পড়লে তাদের সহায়তা নেওয়ার পথ খোলা থাকে;

৩। বিপদে-আপদে সহকর্মীরা পাশে এসে দাঁড়ান;

৪। জরুরি ছুটির প্রয়োজন হলে সহকর্মীরা বাড়তি কাজ করে সহায়তা করেন এবং

৫। কর্মক্ষেত্রে সন্তুষ্টি লাভ হয়।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি পৃথিবীর প্রাচীন পেশা?

ক. কারখানার শ্রমিক
খ. কৃষিকাজ
গ. ইঞ্জিনিয়ারিং
ঘ. চিকিৎসা

২। বাংলাদেশের কোন শিল্প বর্তমানে বিশ্বখ্যাত?

ক. কৃষি
খ. খনি
গ. পোশাক
ঘ. নির্মাণ

৩। শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা, কারণ–

i. এ পেশায় গেলে সমাজে সম্মান পাওয়া যায়
ii. এ পেশায় থাকলে সমাজের অনেকের সাথে পরিচিত হওয়া যায়
iii. শিক্ষকগণ ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের কারিগর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পারভেজ রায়হান সম্প্রতি একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কোম্পানির জন্য তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। তিনি এ নিয়োগ প্রক্রিয়া অল্প সময়ে শেষ করতে চান।

৪. জনাব পারভেজ রায়হান স্বল্প সময়ে কর্মী নির্বাচনের জন্য কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করবেন?

ক. জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন
খ. চাকরির ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন
গ. ব্যক্তিগত খোঁজ
ঘ. লিফলেট বিতরণ

৫. এ মাধ্যমটি ব্যবহারের ফলে তিনি–

i. সহজেই অনেকের জীবনবৃত্তান্ত পেয়ে যাবেন
ii. যোগ্যলোক নাও পেতে পারেন
iii. জীবনবৃত্তান্ত বাছাই প্রক্রিয়া সহজ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুলতানার পরিবারে সংসার ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ অনেক। যদিও স্বামী ভালোই আয় করেন, তবু আর একটু ভালো থাকার জন্য সুলতানার ইচ্ছে হয় উপার্জনের। সুলতানা ভাবতেন, কীভাবে তিনি স্বামীকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারেন। নানা ভাবনার মধ্য দিয়ে হঠাৎ উঁকি দেয় আউটসোর্সিংয়ের কাজ করার কথা। তিনি পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর প্রতিবেদন পড়েছেন। এবার তা কাজে লাগাতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিলেন। ঘরে বসেই আয়ের জাদুমন্ত্র পেয়ে গেলেন সুলতানা। সংসারের খরচের বাড়তি চাপ ভালোভাবে সামলে তিনি আজ সফল। সংসার ও ছেলেমেয়ের পরিচর্যার পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর কাজ। বেসিস আউটসোর্সিং পুরস্কার-২০১৪-এ তিনি নারী বিভাগে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছেন।

ক. আউটসোর্সিং কী?

খ. পেশা বলতে কী বোঝায়?

গ. সুলতানার কাজের প্রধান মাধ্যমটি বর্ণনা করো।

ঘ. সুলতানার কাজের ক্ষেত্রে পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি মূল্যায়ন করো।

সমাপ্ত